সূচিপত্র

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

●১০ম বর্ষ ●৪র্থ সংখ্যা ●ফেব্রুয়ারি ২০২৬

Web : www.al-itisam.com

রামাদানের আগমনে আমাদের প্রস্তুতি

সমাগত মহিমান্বিত রামাযান: স্বাগত জানানোর পদ্ধতি

ছিয়াম সাধনা: শরীর, মন ও আত্মার পূর্ণতা



MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:١٠، شعبان و رمضان ١٤٤٧هـ/ فبراير ٢٠٢٤م العدد:٤ ، الجزء :١١٢
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত

প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বিরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مجلة الإعتصام الشهرية

www.al-itisam.com

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

১০ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২৬ইং,
মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩২বঙ্গাব্দ, শাবান- রমজান ১৪৪৭

উপদেষ্টা
শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
মো. আকরাম হোসেন
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

বিভাগীয় সম্পাদক
মো: নাসির উদ্দিন, আল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মোঃ নাইমুল ইসলাম

ফাতাওয়া হটলাইন: ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ

প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০
সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট
youtube.com/c/alitisamtv
If facebook.com/alitisam 2016
monthlyalitisam@gmail.com

সূচিপত্র

» **সম্পাদকীয় ॥ ০২**

» **দারসে হাদীস**
ছিয়ামের ফযীলত ॥ ০৩
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

» **প্রবন্ধ**
ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান (পর্ব-১১) ॥ ০৫
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী-১১ম পর্ব) ॥ ০৯
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

শা'বান মাসের গুরুত্ব ও প্রচলিত শবেবরাত ॥ ১২
আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ

রামাযানের আগমনে আমাদের প্রস্তুতি ॥ ১৬
মো. আকরাম হোসেন

নতুন বছর ২০২৬ ও সময়ের সদ্ব্যবহার ॥ ২০
ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

সমাগত মহিমান্বিত রামাযান: স্বাগত জানানোর পদ্ধতি ॥ ২১
মূল: মুহাম্মাদ আস-সাইয়িদ
অনুবাদ: শুআইব বিন আহমাদ

ছিয়াম সাধনা: শরীর, মন ও আত্মার পূর্ণতা ॥ ২৬
সায়্যিদ তানভীর নদবি

» **হারামাইনের মিম্বার থেকে**
তাক্বওয়া ও সুন্দর চরিত্রের নিবিড় সম্পর্ক ॥ ২৯
অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

» **কুরআনের মর্মবাণী**
রবের বাণী (পর্ব-৩) ॥ ৩২
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» **ফাযায়েলে আমল ॥ ৩৪**
মাহবূবুর রহমান মাদানী

» **সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন**
ওযূর সুন্নাতসমূহ ॥ ৩৫
আল-ইতিছাম ডেস্ক

» **চিন্তাধারা**
এআই ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নতুন বছর: ২০২৬ ও আমাদের করণীয় ॥ ৩৭
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**
আমিও ছিয়াম রাখব! ॥ ৩৯
আব্দুল হাসিব বিন আব্দুর রহমান

» **কবিতা ॥ ৪১**
» **সংবাদ ॥ ৪২**
» **সওয়াল-জওয়াব ॥ ৪৪**



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

নির্বাচনকেন্দ্রিক যত গুনাহ

গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক। ইসলামী নেতৃত্ব নির্ধারণ পদ্ধতি পারস্পরিক সহযোগিতা, পরামর্শভিত্তিক ও মনোনয়নমূলক। নেতৃত্ব নির্বাচনের যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা গণতন্ত্রে দেখা যায়, সেই অসুস্থ প্রতিযোগিতার সঙ্গে অসংখ্য গুনাহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেউ চাইলেও এই সমস্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকা অনেক কঠিন।

১. মিথ্যা ওয়াদা: নির্বাচনের সময় নেতা ও ভোটার উভয়ে মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে থাকে। নেতা যা করতে পারবেন না অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন না—এ কথা জেনেও নির্বাচনি ইশতেহারে তা উল্লেখ করে থাকে। জনগণের ভোট নেওয়ার জন্য মিথ্যা ওয়াদা দেওয়া তাদের পেশায় পরিণত হয়ে যায়। প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা বলা রপ্ত করার মাধ্যমে তারা একই মিথ্যা বারবার বলতে থাকে। অন্যদিকে জনগণও প্রত্যেক এমপি প্রার্থীকে মিথ্যা ওয়াদা দেয় যে, সে তাকেই ভোট দেবে। এই মিথ্যা ওয়াদার বিনিময়ে সে সকল প্রার্থীর নিকট থেকে কিছু অর্থনৈতিক লাভের আশা করে থাকে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মুনাফেকের আলামত তিনটি: সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৩)*।

২. পারস্পরিক গীবত ও অপবাদ: ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে মানুষের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা। বিচারযোগ্য কোনো ত্রুটি থাকলে সেটি দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। মানুষের পারস্পরিক দোষ চর্চা করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। অথচ গণতন্ত্রে পারস্পরিক দোষ চর্চাকে শৈল্পিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গীবত ও অপবাদ ছাড়া এখানে রাজনীতি অসম্ভব। যে নেতা ও দল যত বেশি অন্য নেতা ও দলের নিন্দা করতে পারবে এবং ভুল ধরতে পারবে, ততই তার রাজনীতি টিকে থাকবে। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের দেহ ও মনকে কলুষিত করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে... তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে?' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)*।

৩. হারাম টাকার লেনদেন ও দুর্নীতি: গণতন্ত্রের সঙ্গে টাকার লেনদেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রচার-প্রচারণা থেকে শুরু করে কর্মীবাহিনী ধরে রাখার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো প্রেসিডেন্ট ইলন মাস্কের অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে নির্বাচন করেছে। পাকিস্তানের ইমরান খান ক্রাউডফান্ডিং তথা দানের মাধ্যমে নির্বাচন করতেন। বাংলাদেশেও অনেকেই ক্রাউডফান্ডিং করে নির্বাচন করছেন এ বছর। তবে বিষয়টি পুরো নির্বাচন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দু-একজন পরিচিত প্রার্থী ক্রাউডফান্ডিং করতে সক্ষম হবেন। সকল প্রার্থী তো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল বা পরিচিত নন। সুতরাং সকলকে অর্থের বিভিন্ন জোগান তৈরি করতে হয়। আর এখানেই শুরু হয় স্বার্থান্বেষী মহলের খেলা। সবাই নিজ নিজ স্বার্থ আদায়ের জন্য এমপি মহোদয়কে মাসোহারা বা চাঁদা দিতে অভ্যস্ত হয়। এমপি সাহেবও চাঁদার লোভে তাদের সকল অনৈতিক কাজ দেখেও না দেখার ভান করেন। এভাবে সমগ্র দেশে নিম্ন লেভেল থেকে উপর পর্যন্ত দুর্নীতির একটি ইকোসিস্টেম গড়ে ওঠে। সবাই হারাম অর্থ লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। রাষ্ট্রের অলিগার্ক দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। রাসূল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতাকে অভিশাপ দিয়েছেন' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০)*। তিনি আরও বলেন, 'যে দেহ হারাম খাদ্য/উপার্জনে লালিত-পালিত হয়েছে, সে দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(সিলসিলা ছহীহা, হা/২৬০৯; মিশকাত, হা/২৭৮৭)*।

বাকি অংশ ১১ নং পেজে...

দারসে হাদীছ

ছিয়ামের ফযীলত

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

সরল অনুবাদ: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেন, ছিয়াম ব্যতীত প্রতিটি আমলই আদম সন্তানের নিজের। তবে ছিয়াম আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। ছিয়াম ঢালস্বরূপ। (অতএব) ছিয়ামরত অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় বা শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে যুদ্ধে (ঝগড়ায়) লিপ্ত হয়, তবে সে যেন বলে, আমি ছিয়ামরত। সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ছায়েমের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও সুগন্ধিময়। ছায়েমের জন্য দুটি আনন্দঘন মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হয়— (ক) যখন সে ইফতার করে এবং (খ) যখন সে তার রবের সাথে দেখা করবে’।[১]

ব্যাখ্যা: ছিয়ামের মহান শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং যারা ছিয়াম পালন করে, তাদের জন্য মহান রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে স্থায়ী সম্মানের ব্যবস্থা রয়েছে। তারা নিজেদেরকে খাদ্য, পানীয় ও আকাঙ্ক্ষার উপভোগ থেকে বঞ্চিত করে, তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে দিয়ে থাকেন। অন্যান্য ইবাদত পালনকারীর চেয়ে তিনি তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উক্ত হাদীছে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তাঁর জন্য’। অর্থাৎ এতে তার জন্য বিশেষ অধিকার রয়েছে এবং এমন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে, যার সম্পর্কে সে অবহিত হতে পারে। সে কখনও তার আমলের প্রতিদান আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তাৎক্ষণিক পেয়ে যায়, তাছাড়া দুনিয়াতেও এর সুবিধা ভোগ করতে পারে; তবে ছিয়াম এর আওতাভুক্ত নয়। কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে আমার জন্য এবং আমি ছাড়া এর ফলশ্রুতিতে ঘটমান পরিণতি সম্পর্কে কেউ অবগত নয়।

‘আর আমি এর প্রতিদান দিব’ অর্থাৎ তার পুরস্কার প্রদানের দায়িত্ব আমার। তার পুরস্কারের পরিমাণ নির্ধারণ এবং পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমি একক। তার অন্যান্য ভালো ইবাদত সম্পর্কে হয়তো কিছু মানুষ অবগত হয়ে থাকতে পারে। সৎ আমলের ছওয়াবের পরিমাণ মানুষের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে তথা তা ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে তা ছিয়ামের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আল্লাহ তাকে পরিমাণ নির্ধারণ ছাড়াই পুরস্কৃত করবেন। যেমনটি ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, ‘আদম সন্তানের প্রতিটি কাজের প্রতিদান বহুগুণ হবে। নেকী ১০ গুণ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। তবে ছিয়ামের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ এটি আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব’।[২] বিষয়টি যখন এমন যে, ছিয়ামের প্রতিদানের পরিমাণ কারও পক্ষে গণনা করা সম্ভব নয়, তখন আল্লাহ এই ইবাদতের প্রতিদান প্রদানের দায়িত্ব ফেরেশতাদের উপর অর্পণ করেননি; বরং তিনি নিজে এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যখন তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এরূপ ইবাদতের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অতুলনীয়।

তারপর তাঁর বাণী ‘ছিয়াম ঢালস্বরূপ’ বাক্যে ছিয়ামকে দুনিয়ার পাপ থেকে মুক্তি, পরকালের শাস্তি থেকে সুরক্ষার রক্ষাকবচ এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তির দুর্গ বলা হয়েছে। অতঃপর তিনি ছায়েমকে (رفث) অশ্লীলতা ও শোরগোল (صخب) থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যা তার কথাবার্তা, পোশাক ও বেশভুষা এবং কোলাহল তথা চিৎকার বা ঝগড়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেউ যদি ছায়েমকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে চায়; তবে সে যেন বলে, আমি একজন ছায়েম। যাতে সে তার প্রতিপক্ষকে ও নিজেকে ঝগড়া থেকে বিরত রাখতে পারে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিয়াম অবস্থায় অশ্লীলতা ও শোরগোল থেকে বিরত থাকা। তবে এর অর্থ এমন নয় যে, ছিয়াম ব্যতীত অন্যান্য সময়ে অশ্লীলতা অবলম্বন ও শোরগোল করার সুযোগ আছে।

অতঃপর তিনি বললেন, যে ছায়েম ছিয়ামের হক্ব পূর্ণ করে অর্থাৎ ছিয়ামের ওয়াজিব ও মুস্তাহাবগুলো যথাযথভাবে পালন

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৪।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১।

করে, তার জন্য দুটি বড় আনন্দের সংবাদ রয়েছে— একটি দুনিয়াতে ও অপরটি আখেরাতে।

প্রথমটি হলো যখন সে ইফতার করে, তখন ইফতারের খাদ্য খেয়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করে, যা তাকে আনন্দিত করে। এটি হলো তার শারীরিক আনন্দ। অথবা হতে পারে তিনি কোনো প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত সুস্থ শরীরে একমাত্র মহান রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছিয়াম সম্পাদন করতে পেরেছেন। তিনি এই ইবাদত অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পালন করতে পেরেছেন। এখানে লোক-দেখানো বা লোকলজ্জার লেশমাত্র ছিল না।

দ্বিতীয়ত, যখন তিনি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন ছিয়ামের ফলাফল পেয়ে আনন্দিত হবেন। এর অর্থ হলো, তিনি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময় ছিয়ামের ছওয়াব পেয়ে অথবা সাক্ষাৎ পাওয়ার আনন্দ পেয়ে অথবা ছিয়াম কবুল হওয়ার সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হবেন। ছিয়ামের অফুরন্ত প্রতিদান সর্বদা প্রবহমান থাকে।

ছিয়ামের পূর্ণ বৈশিষ্ট্যধারী সেই ব্যক্তি, যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুনাহ থেকে, জিহ্বা অশ্লীলতা ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান থেকে, পাকস্থলী পানাহার থেকে এবং গোপনাঙ্গ অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে। ছিয়ামের সর্বোচ্চ পবিত্রতা রক্ষায় তিনি সর্বদা সতর্ক থাকেন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তিনি কথা বলেন না। যদি তার কথা বলার প্রয়োজন হয়, তবে এমন কথা বলেন, যা তার ছিয়ামের পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করে না। তার সমস্ত কথা উপকারী ও ন্যায়সংগত হয়ে থাকে। বৈধ ও ন্যায়সংগত কাজ ছাড়া অন্য কোনো কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িত হন না। এমন ছিয়ামই শরীআতে প্রত্যাশিত। শুধু খাদ্য ও পানীয় বর্জন, বৈধ স্ত্রীর সাথে মিলন এবং সাধারণ অশ্লীলতা বর্জন করা ছিয়াম নয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর বর্ণিত হাদীছে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা, তার উপর আমল করা এবং অজ্ঞতা ত্যাগ করে না; তার খাদ্য ও পানীয় বর্জনের কোনো প্রয়োজন নেই'।[৩]

আর সুনানে ইবনে মাজাহতে বলা হয়েছে, 'এমন অনেক ছায়েম রয়েছে, যার (ছিয়াম পালন করে) ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না'।[৪] প্রকৃত ছিয়ামের দাবি হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে, পেটকে খাদ্য ও পানীয় থেকে, যৌনাঙ্গকে যৌনসুখ ভোগ থেকে, মনকে খারাপ কল্পনা থেকে, কানকে অশ্লীল শ্রবণ থেকে এবং চোখকে অশ্লীল ও হারাম দর্শন থেকে বিরত রাখা। পানাহার যেমন ছিয়ামকে নষ্ট করে দেয়, গুনাহ তেমনি ছিয়ামের ছওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। গুনাহ ছিয়ামের ফলাফলকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয় যে, যেন মনে হয় সে আদৌ ছিয়াম পালন করেনি।

অতঃপর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মহান সত্তার শপথ করেছেন, যার হাতে তাঁর প্রাণ অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তাআলার নামে শপথ করেছেন। এভাবে বলার কারণ হলো, মানুষের আত্মার নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। কোনো বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে শপথ করতেন।

দীর্ঘ সময় ছায়েমের পেট খাদ্যশূন্য থাকার ফলে মুখে সৃষ্ট দুর্গন্ধ হলো 'খালূফ'। ছায়েমের মুখের দুর্গন্ধ মহান আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়ে অধিক উত্তম ও সুগন্ধিময়। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট এ ঘ্রাণের বিশেষ অবস্থান থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ছায়েমকে এমন মর্যাদার আসনে বসাবেন, যা তাকে অন্যদের চেয়ে অধিক সম্মানিত করবে। অন্যদের চেয়ে তাঁর পদমর্যাদা উচ্চতর হওয়ার কারণ হলো, মহান আল্লাহর নৈকট্যের স্থানগুলোর মধ্যে ছিয়াম অন্যতম।

প্রকৃতপক্ষে ছায়েমের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও বেশি সুগন্ধিময় হওয়ার কারণ হলো, ছিয়াম আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর বান্দার মধ্যে এমন গোপন সম্পর্ক স্থাপন করে, যে সম্পর্কে তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। তাই যখন তিনি ফেরেশতাদের মধ্যে সমবেত হন, তখন তাঁর বান্দার সুগন্ধি তাঁকে মুগ্ধ করে তোলে এবং এটি তার জন্য মর্যাদা এবং প্রশংসার কারণ।

ছিয়াম কেবল দেহের নয়, বরং আত্মারও পরিশুদ্ধির মাধ্যম। তাক্বওয়া অর্জন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্যধারণ, কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ইবাদতে মনোযোগী করতে এর ভূমিকা অপরিসীম। যাবতীয় পাপ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা ছিয়াম আমাদেরকে দেয়। ছিয়াম একজন ছায়েমের মনকে এমনভাবে পবিত্র করে যে, সে কোনো খারাপ চিন্তা করতে পারে না। সে তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সব ধরনের অন্যায় কাজ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। সে তার হাত দিয়ে হারাম কোনো কিছুকে স্পর্শ করে না। সে কোনো হারাম পথে তার পা বাড়ায় না। সে কোনো হারাম ও অশ্লীল গান-বাজনা কান দিয়ে শোনে না। হারাম দৃশ্য, অশ্লীল নাচ, হারাম জিনিস চোখ দিয়ে দেখে না। এভাবেই ছিয়াম ছায়েমের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ছিয়াম কেবল দেহের জন্য নয়; আত্মার জন্যও পরিশুদ্ধির মাধ্যম। এটি তাক্বওয়া অর্জন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, দু'আ ও ইবাদতে মনোযোগী হওয়ার শিক্ষা দেয়। এভাবেই ছিয়াম মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন, হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও। হে অকল্যাণের প্রার্থী! থেমে যাও'।[৫]

৩. তিরমিযী, হা/৬৮২, হাদীছটি ছহীহ।
৪. ইবনে মাজাহ, হা/১৬৯০, হাদীছটি ছহীহ।
৫. তিরমিযী, হা/৬৮২, হাদীছটি ছহীহ।

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

(পর্ব-১১)

ইসলামের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার প্রসঙ্গ:

‘ট্রান্সজেন্ডারবাদ মূলত জেন্ডার বিষয়ক পাশ্চাত্যের একটি ধারণা। ট্রান্সজেন্ডার মানে হল, যার মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ জন্মগত লিঙ্গ চিহ্ন থেকে ভিন্ন। এ মতবাদ অনুযায়ী শারীরিক গঠনে সুস্থ স্বাভাবিক কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী বোধ করে, তাহলে সে নারী। অনুরূপভাবে শারীরিক গঠনে সুস্থ স্বাভাবিক কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ বোধ করে, তাহলে সে পুরুষ। অর্থাৎ জন্মগত লিঙ্গ দিয়ে নারী-পুরুষ চিহ্নিত করা হবে না; বরং নারী-পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার মাধ্যম হবে মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ। নিজেকে যা মনে করেন তিনি তা। এ মতবাদে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার জন্য সার্জারির মাধ্যমে বা হরমোন থেরাপির মাধ্যমে শারীরিক কাঠামো পরিবর্তন করা আবশ্যক নয়, করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। সর্বাবস্থায়ই সে ট্রান্সজেন্ডার’।[৬]

‘ট্রান্সজেন্ডার হলো দুটি ইংরেজি শব্দ Trans ও gender-এর সংমিশ্রণ। Trans অর্থ পরিবর্তন করা এবং gender মানে লিঙ্গ। Transgender এমন একজন পুরুষ বা নারীকে বোঝায়, যাকে আল্লাহ তাআলা একজন পূর্ণ পুরুষ বা নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তারা এই সৃষ্টিতে অসন্তুষ্ট। তারা আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও তাদের জন্মগত লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ থেকে নারী বা নারী থেকে পুরুষ হতে চায়’।[৭]

মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ ‘আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন’ *(আর-রূম, ৩০/৩০)*। উক্ত আয়াতের তাফসীরে হাসান বাছরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতে পরিবর্তন দ্বারা উলকি বা ট্যাটু উদ্দেশ্য।[৮] কারণ ট্যাটুর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা হয়।

বরং আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সরাসরি শয়তানের নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা বলেন,(৭১১) ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (৭১১) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (৮১১) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ ‘আর তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিশাপ করেছেন এবং সে (শয়তান) বলেছে, আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবই, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই, তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই’ *(আন-নিসা, ৪/১১৭-১১৯)*। উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন,وَقالَت طائِفَةٌ: الإشارَةُ بِالتَّغْيِيرِ إِلَى الوَشْمِ، وَما جَرَى مَجْرَاهُ مِنَ التَّصَنُّعِ لِلحُسْنِ ‘একদল আলেম বলেছেন, এখানে (আল্লাহর সৃষ্টিকে) পরিবর্তন করার দ্বারা ট্যাটু এবং এর মতো সৌন্দর্য অর্জনের জন্য কৃত্রিমভাবে শরীর পরিবর্তনের অন্য পদ্ধতিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে’।[৯] আল্লামা দাম্মাহমু আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী রহিমাহুল্লাহ বলেন,وَكَذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِتَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ الْوَشْمُ، فَهُوَ يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْوَشْمَ حَرَامٌ. ‘আর একইভাবে, ‘আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন’ বলতে এখানে ট্যাটু বোঝানো হয়েছে— উক্ত মতের উপর ভিত্তি করে এটিও প্রমাণিত হয় যে, ট্যাটু করা হারাম’।[১০]

মূলত যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করে, সে আসলে দাবি করে যে, সে আল্লাহর তৈরি জিনিসকে ‘আরও সুন্দর’ করছে! যেহেতু এটি আল্লাহর সিদ্ধান্ত, তাই এটি পরিবর্তন করার চেষ্টা করা একটি বড় অপরাধ ও নিন্দনীয় কাজ। এটি এমন বড় গোনাহ, যার একটি শাস্তি হচ্ছে আল্লাহর লা‘নত। একারণেই আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তনকারীদের উপর মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ ‘আল্লাহ ঐ নারীর উপর লা‘নত করেন, যে পরচুলা লাগায় ও অপরকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়। আর যে নারী উলকি (ট্যাটু) অঙ্কন করে এবং যে তা করায়’।[১১] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ‘আল্লাহ লা‘নত করেন সেসব নারীর উপর, যারা উলকি অঙ্কন

৬. https://www.alkawsar.com/bn/article/3633/

৭. https://www.somoynews.tv/news/2024-06-19/TwUv98Iz

৮. সুয়ূতী, আদ-দুর্রুল মানছূর, ২/৬৯০।

৯. তাফসীর কুরতুবী, ৫/৩৯২।

১০. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, আযওয়াউল বায়ান ফী ঈযাহিল কুরআন বিলকুরআন, ৫/৩৯২।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩৩।

করে এবং যারা তা করায়; সেসব নারীর উপর, যারা ভ্রু প্লাক (Eyebrow Plucking) করে এবং সেসব নারীর উপর, যারা সৌন্দর্যের জন্য সামনের দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়'।[১২] ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ 'নবী ﷺ ঐ নারীর উপর লা'নত করেন, যে পরচুলা লাগায় ও অপরকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়। আর যে নারী উলকি (ট্যাটু) অঙ্কন করে এবং যে তা করায়'।[১৩]

উক্ত কাজগুলো এমন গর্হিত যে, কোনো অবস্থাতেই সেগুলোর অনুমতি নেই। না প্রয়োজনে, না স্বামীর অনুমতিতে, না দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য। আসমা বিনতে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» 'এক মহিলা নবী ﷺ—এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এক নববিবাহিতা মেয়ে হামরোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাতে তার চুল পড়ে গেছে। আমি কি তাকে পরচুলা লাগিয়ে দিব? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থিনী নারীদের লা'নত করেছেন'।[১৪]

এত নিষেধাজ্ঞা ও অভিশাপ সত্ত্বেও ট্যাটু, ভ্রু প্লাক ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গতিতে। এর ঢেউ বাংলাদেশেও আছড়ে পড়ছে। মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত বহু নারী-পুরুষ এই পাপে জড়িয়ে পড়ছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, একটি পশ্চিমা দেশের প্রায় ২০% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ট্যাটু করে থাকে। এর মধ্যে ৫—৯% খ্রিষ্টান ও মুসলিম, যাদের অধিকাংশের বয়স ১৬ থেকে ৩৮ বছর। তারা একটি ট্যাটু করার জন্য প্রায় ৭,০০০ দিরহাম বা ৯০০ ডলার খরচ করছে; অথচ তাদের সবাই ধনী নয়; বরং তাদের মধ্যে ৫৬% বেকার।[১৫]

যাহোক, যদি ট্যাটু, ভ্রু প্লাক ইত্যাদি এত মারাত্মক হয়, তাহলে ট্রান্সজেন্ডার (Transgender) বা লিঙ্গ পরিবর্তন কতটা মারাত্মক হতে পারে! ইসলামে বিভিন্ন অঙ্গ পরিবর্তনেই কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তাহলে পুরো লিঙ্গ পরিবর্তন কতটা মারাত্মক হতে পারে! পুরুষকে নারী বানানো অথবা নারীকে পুরুষ বানানো তো দূরের কথা, বরং এর চেয়ে কম পর্যায়ের বিষয়েও নবী ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا 'নবী ﷺ নারীসুলভ আচরণকারী পুরুষ এবং পুরুষসুলভ আচরণকারী নারীর উপর অভিশাপ করেছেন। তিনি বলেছেন, এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। তিনি নিজে একজনকে বের করে দিলেন এবং উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আরেকজনকে বের করে দিলেন'।[১৬] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা আরো বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ 'নবী ﷺ অভিশাপ করেছেন সেই সকল পুরুষকে, যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। তেমনি সেই সব নারীকেও অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে থাকে'।[১৭] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ করেছেন সেই পুরুষকে, যে নারীর ঢঙে (স্টাইলে) পোশাক পরে এবং সেই নারীকে, যে পুরুষের ঢঙে (স্টাইলে) পোশাক পরে'।[১৮]

ফলে কারো জন্য নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ থেকে নারী হওয়া বা নারী থেকে পুরুষ হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে যেমন অত্যন্ত গর্হিত কাজ, তেমনি চিকিৎসাশাস্ত্রেও এর নানাবিধ স্বাস্থ্যক্ষতি প্রমাণিত।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত, আল্লাহ তাকে যে অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, তা মেনে নেওয়া। কারণ আল্লাহ যেভাবে তাকে সৃষ্টি করেছেন, সেটিই তার জন্য উপযুক্ত। মানুষ তো জানেই না— যদি সে নারী হতো, তবে হয়তো তা তার জন্য ভালো হতো না। আর যদি নারীটি পুরুষ হতো, তবে হয়তো তা তার জন্য ক্ষতিকর হতো। তিনি আপনাকে যে রূপে সৃষ্টি করেছেন—এভাবেই তিনি আপনাকে বানিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি আপনাকে চেয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ 'তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে তিনি চান। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান, ৩/৬)*।

পুরুষ হোক বা নারী, শ্বেতাঙ্গ হোক বা কৃষ্ণাঙ্গ—সবই তাঁর সৃষ্টি এবং এটাই তাঁর হুকুম ও ইচ্ছা। মানুষ যদি এ সত্যটা জানত ও মানত, তাহলে তারা স্বস্তিতে থাকত এবং অনেকে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করার কথা ভাবত না।

আল্লাহর কিছু বান্দা আছে, যাদের জন্য দারিদ্র্যই উপযুক্ত; যদি তারা ধনী হয়ে যেত, তবে তাতে তাদের ক্ষতি হতো। আবার কেউ কেউ আছে, যাদের জন্য সম্পদই উপকারী; যদি তারা গরীব হতো, তবে তাদের ক্ষতি হতো।

১২. ছহীহ বুখারী, হা/৪৮৮৬।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৪০; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৪।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২১২২।
১৫. দ্রষ্টব্য: https://www.alukah.net/social/0/128674/الوشم-في-الإسلام
১৬. দ্রষ্টব্য: https://www.alukah.net/social/0/128674/الوشم-في-الإسلام
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫।
১৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫।

কিছু নারী পুরুষ হলে যুদ্ধ করতে পারতেন, এমন ইচ্ছে করেছিলেন— শুধু ইচ্ছা হিসেবেই। তখন আল্লাহ নিষেধ করে বলেন, ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ 'আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের একজনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে, তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে, তা থেকে' *(আন-নিসা, ৪/৩২)*।

বাস্তবতা সম্পর্কে জানেন কি?

কোনোভাবেই নারীকে প্রকৃতপক্ষে পুরুষ বানানো বা পুরুষকে প্রকৃতপক্ষে নারী বানানো সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে ইসলামওয়েব-এর একটি বক্তব্য আপনাদের খেদমতে পেশ করছি: 'লিঙ্গ পরিবর্তন বা লিঙ্গ সংশোধন প্রকৃতপক্ষে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহ্যিক পরিবর্তন, যাতে তারা বিপরীত লিঙ্গের অঙ্গের মতো দেখায়, কিন্তু এতে প্রকৃত পরিবর্তন হয় না। যেমন একজন পুরুষ নারী হয়ে ঋতুস্রাব বা গর্ভধারণ করতে পারবে না এবং একজন নারীও পুরুষ হয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করতে পারবে না। সউদী আরবের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. মুহাম্মাদ আলী আল-বার এই ধরনের অপারেশনের (লিঙ্গ পরিবর্তন/ Sex Reassignment Surgery/Gender Transition Surgery) প্রকৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে বলেন,

পুরুষের ক্ষেত্রে: যারা জৈবিকভাবে পুরুষ, তাদের পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ কেটে ফেলা হয়। ছোট কৃত্রিম ভ্যাজাইনা তৈরি করা হয় বাকি অণ্ডকোষের মাধ্যমে। কখনও কখনও কৃত্রিম স্তন বসানো হয় এবং ঐ ব্যক্তিকে প্রচুর মহিলা-হরমোন দেওয়া হয়, যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং শরীরের চর্বি বিন্যস্ত হয়ে নারীর মতো হয়। যদিও এমন ব্যক্তির বাহ্যিক চেহারা মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে, সে আসলেই তাকে নারী ভাবতে পারে— অথচ তার জৈবিক কাঠামো অনুযায়ী সে এখনও পুরুষই আছে, যদিও সম্পূর্ণভাবে বিকৃত। সুতরাং তার কোনো ডিম্বাশয় বা জরায়ু নেই এবং এমন ব্যক্তির কখনোই ঋতুস্রাব হয় না। একইভাবে তার পক্ষে গর্ভধারণ করাও মোটেও সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষেত্রে: যারা জৈবিকভাবে সম্পূর্ণ নারী, তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা তার ইচ্ছা অনুযায়ী বাহ্যিকভাবে পুরুষের মতো একটি নতুন রূপ তৈরি করার চেষ্টা করেন। এতে চিকিৎসকেরা তার জরায়ু ও ডিম্বাশয় অপসারণ করেন, যোনিপথ বন্ধ করেন এবং বাহ্যিকভাবে পুরুষসদৃশ একটি অঙ্গ তৈরি করেন, যা প্রয়োজনের সময় বিশেষ বিদ্যুৎচালিত ব্যবস্থার সাহায্যে সক্রিয় হতে পারে। এছাড়াও চিকিৎসকরা তার স্তন অপসারণ করেন এবং তাকে প্রচুর পরিমাণে পুরুষ-হরমোন দেন, যার ফলে তার কণ্ঠস্বর ভেঙে যায়—পুরুষের কণ্ঠস্বরের মতো হয়ে যায়। একইভাবে গোঁফ ও দাড়ির চুলও পুরুষদের মতো করে বৃদ্ধি পেতে পারে আর পুরুষ-হরমোন ও ব্যায়ামের প্রভাবে তার পেশী আরও শক্তিশালী হয়। এভাবে একজন সম্পূর্ণ নারী ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে পুরুষের মতো রূপ নেয়। এই ব্যক্তি যৌনসম্পর্ক করতে সক্ষম হলেও নিশ্চিতভাবেই সে বীর্যস্খলন করতে পারে না—কারণ তার বীর্য নেই এবং তার ঔরশে কখনোই সন্তান জন্মদান সম্ভব নয়।[১৯]

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে ট্রান্সজেন্ডারের আড়ালে ওরা আসলে কী চায়?

ওরা সমকামিতাকে ছড়িয়ে দিতে চায়। ওরা পৃথিবীকে নষ্ট করতে চায়। ওরা ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়। ওরা পরিবার ও সমাজব্যবস্থাকে নষ্ট করতে চায়। দ্বীন ও ঈমানহীন দেশ ও জাতি বানাতে চায়। ওরা রুগ্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ওরা আমাদেরকে মানবরূপী পশু বানাতে চায়। ওরা আমাদের মনুষ্যসমাজকে পশুসমাজে পরিণত করতে চায়। এককথায়, ওরা আমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট করতে চায়।

কখন লিঙ্গ সম্পর্কিত চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার জায়েয?

আমরা এ প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের মন্তব্য দেখব। সউদী আরবের বিখ্যাত ফতওয়া বোর্ড আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ-এর মুফতীগণ একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, '...**তৃতীয়ত:** যদি আপনার পুরুষত্ব নিশ্চিত না হয় এবং কেবল আপনার দেহের বাহ্যিক পুরুষালি গঠন দেখে আপনি নিজেকে পুরুষ মনে করেন—অথচ আপনার মনের ভেতরে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য অনুভব করেন, পুরুষদের প্রতি আবেগগতভাবে দুর্বল হন এবং তাদের প্রতি যৌনভাবে আকৃষ্ট হন, তবে আপনার সিদ্ধান্তে স্থির থাকুন (তাড়াহুড়ো করবেন না)। আপনি যে অপারেশনের কথা উল্লেখ করেছেন, তা করার জন্য অগ্রসর হবেন না। বরং নিজেকে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে তুলে ধরুন।

যদি চিকিৎসকরা নিশ্চিত হন যে, আপনি বাহ্যিকভাবে পুরুষ হলেও প্রকৃতপক্ষে একজন নারী, তবেই তাদের কাছে নিজেকে সোপর্দ করুন— যাতে তারা অপারেশনের মাধ্যমে আপনার নারীত্বের প্রকৃত সত্য উন্মোচন করতে পারেন। এটি আপনাকে পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত করা নয়—কারণ সেটি করার ক্ষমতা তাদের নেই—বরং এটি হলো আপনার প্রকৃত অবস্থাকে প্রকাশ করা এবং আপনার দেহ ও মনের ভেতরে থাকা দ্বিধা ও অস্পষ্টতা দূর করা।

১৯. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/204994/عمليات-تحويل-الجنس-حقيقتها-وحكمها

আর যদি অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট না হয়, তবে অপারেশন করার মতো ঝুঁকি নেবেন না। আল্লাহর ফয়সালা মেনে নিন এবং আপনার রবের সন্তুষ্টির আশায় এই পরিস্থিতির ওপর ধৈর্য ধারণ করুন। নিজের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও স্পষ্ট ধারণা ছাড়া অপারেশনের ভয়াবহ পরিণাম থেকে বাঁচতে এটি প্রয়োজন। আল্লাহর দিকে ফিরে যান এবং তাঁর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি আপনার প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে দেন এবং আপনার মানসিক জট খুলে দেন। নিশ্চয়ই তাঁর হাতেই সবকিছুর রাজত্ব এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান'।[২০]

বিশ্ববিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ফতওয়ার ওয়েবসাইট islamqa.info-তে এসেছে, 'যখন কোনো ব্যক্তি মূলত পুরুষ বা নারী হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তার অঙ্গগুলো স্পষ্ট নয়। তখন তার আসল সৃষ্টিগত অঙ্গকে প্রকাশ করার জন্য অস্ত্রোপচার করা বৈধ এবং তাকে এমন ওষুধ বা হরমোন দেওয়া বৈধ, যা আল্লাহ যে স্বভাবের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন, তা শক্তিশালী করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নারী ও পুরুষ—উভয় প্রজনন অঙ্গ নিয়ে জন্মায় (হিজড়া), তার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে কোনো একটিকে অপসারণ করে অন্যটিকে প্রকাশ করা বৈধ নয়। বরং অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারিত করেছেন, তা স্পষ্ট হয়ে যায়; তার জীবনের কিছু সময় পেরোনোর পর সেটি প্রকাশও পেতে পারে'।[২১]

আরেকটি বিখ্যাত ওয়েবসাইট islamweb.net-এ বলা হয়েছে, 'যদি বিশ্বস্ত চিকিৎসকদের প্রতিবেদনে প্রমাণিত হয় যে, এই যুবকের মধ্যে নারীত্বের বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রাধান্য পাচ্ছে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তার জন্য লিঙ্গ-সংশোধনের (অর্থাৎ সৃষ্টিগত বাস্তব লিঙ্গকে স্পষ্ট করা) অপারেশন করাতে কোনো দোষ নেই। আর তার পরিবারকেও এতে আপত্তি করা উচিত নয়। কারণ তাকে বর্তমান অবস্থায় রেখে দিলে যে কষ্ট ও দুর্ভোগ সৃষ্টি হবে, তা সহ্যসাধ্য নয়'।[২২]

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া এক নয়: ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়ার মধ্যকার পার্থক্য জানা জরুরী। এই পার্থক্য না জানার কারণে ট্রান্সজেন্ডারবাদের কথা শুনলে অনেকেই মনে করে, এটা হয়তো হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন। কিন্তু এটা আসলে মারাত্মক ভুল ধারণা। হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার কোনোভাবেই এক নয়। এই দুই শ্রেণির মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

২০. ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ২৫/৪৮-৪৯।

২১. https://islamqa.info/ar/answers/138451/متى-يجوز-اجراء-عملية-تحويل-الجنس-من-ذكر-لانثى-والعكس

২২. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/55744/متى-يباح-تحويل-الجنس

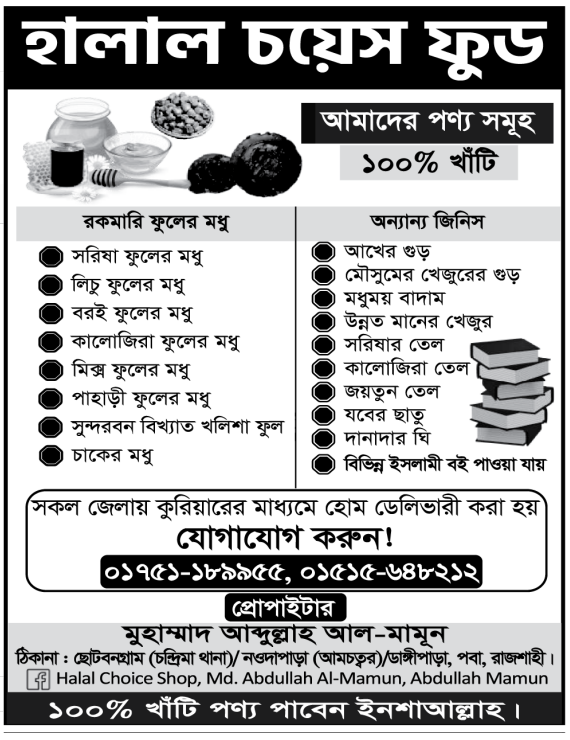
আমরা আগে ট্রান্সজেন্ডার সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। হিজড়ার সংজ্ঞায় এসেছে, مَنْ لَهُ آلَتَا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، أَوْ مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا أَصْلاً، وَلَهُ ثُقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْل 'যার কাছে পুরুষ ও নারী উভয় ধরনের অঙ্গ রয়েছে অথবা যার কাছে এ দুটির কোনোটি নেই, তবে এমন একটি ছিদ্র আছে, যেখান দিয়ে প্রস্রাব বের হয়'।[২৩] মানুষ হয় সম্পূর্ণ পুরুষ অথবা নারী। যাদের দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, তারা পুরুষ। আর যাদের দেহ ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, তারা নারী। এটা শুধু বাহ্যিক যন্ত্রপাতির বিষয় নয়, পুরো প্রজননব্যবস্থার বিষয়। সুতরাং এখন যারা জন্মগতভাবে অস্বাভাবিক এবং কিছু যৌন ত্রুটি বা জটিলতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যাকে আমরা হিজড়া বলি, ইংরেজিতে তাদের বলা হয়, ইন্টারসেক্স (Intersex)। পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডাররা ইন্টারসেক্স নয়, তারা সম্পূর্ণরূপে পুরুষ বা নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে এবং পরে লিঙ্গ পরিবর্তন করে। মূলত: বর্তমানে যারা নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার দাবি করছে, তাদের বেশিরভাগই ইন্টারসেক্স নয়।[২৪]

হে আল্লাহর বান্দা ও বান্দীরা! পরাক্রমশালী মহান আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাঁর গযব থেকে সাবধান হোন।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

২৩. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ২০/২১।

২৪. https://teachers.gov.bd/index.php/blog/details/772336



কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

(মিন্নাতুল বারী-১১তম পর্ব)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي المَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَجَبْتُكَ». فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي المَسْأَلَةِ، فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

৬৩. সরল অনুবাদ: আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি উটে চড়ে আসলেন। তিনি উটটিকে (মসজিদের কাছে/প্রাঙ্গণে) বসালেন, তারপর উটের পা বেঁধে দিলেন। এরপর তিনি লোকদের বললেন, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে? নবী ﷺ তখন তাদের মাঝখানে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললাম, এই যে সাদা গায়ের রঙের লোকটি হেলান দিয়ে আছেন তিনি। লোকটি বললেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র! নবী ﷺ বললেন, 'আমি তোমার কথার জবাব দিতে প্রস্তুত। বলো কী বলতে চাও'। লোকটি বললেন, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব, প্রশ্নে আমি কিছুটা কড়াকড়ি করব; আপনি মনে কষ্ট পাবেন না তো? তিনি ﷺ বললেন, 'যা ইচ্ছা প্রশ্ন করো'। তিনি বললেন, আপনার রব ও আপনার আগের লোকদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে সকল মানুষের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি ﷺ বললেন, 'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, অবশ্যই হ্যাঁ'। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে আদেশ করেছেন যে, আমরা দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করব? তিনি ﷺ বললেন, 'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, অবশ্যই হ্যাঁ'। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে আদেশ করেছেন যে, আমরা বছরের এই মাসে (রামাযান) ছিয়াম রাখব? তিনি ﷺ বললেন, 'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, অবশ্যই হ্যাঁ'। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে আদেশ করেছেন যে, আপনি আমাদের ধনীদের থেকে এই ছাদাক্বা (যাকাত) নেবেন আর তা আমাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করবেন? নবী ﷺ বললেন, 'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, অবশ্যই হ্যাঁ'। তখন লোকটি বললেন, আপনি যা নিয়ে এসেছেন, আমি তাতে ঈমান আনলাম। আর আমি আমার গোত্রের লোকদের প্রতিনিধি/বার্তাবাহক। আমি যিমাম ইবনু ছা'লাবা, বানূ সা'দ ইবনু বাকর গোত্রের একজন।

আর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন মূসা বিন ইসমাঈল আলী ইবনে আব্দুল হামীদ থেকে, তিনি সুলায়মান ইবনু মুগীরা থেকে, তিনি ছাবেত আল-বুনানী থেকে, তিনি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে।

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

(১) সাঈদ আল-মাক্বুরী (سَعِيدٌ المَقْبُرِيّ): আবূ সা'দ সাঈদ ইবনু আবী সাঈদ কায়সান আল-লায়ছী আল-মাদানী (أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان الليثي)। তিনি বাক্বী কবরস্থানের এলাকায় থাকতেন, তাই তার লাক্বাব হয়ে যায় আল-মাক্বুরী। ইমাম যাহাবী তাকে الإمام الحدث الثقة বলেছেন। আবূ হাতেম صدوق বলেছেন। তিনি তার পিতা আবূ সাঈদ কায়সান, আয়েশা, আবূ হুরায়রা, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ, উম্মু সালামা, ইবনু উমার, আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ ছাহাবী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে ইমাম মালেক, লায়ছ, ইবনু সা'দসহ অনেকেই হাদীছ শ্রবণ করেছেন।

ওফাত: ১২৫ হিজরী বলা হয়েছে, আবার ১২৩/১২৬ও বলা হয়েছে। বয়স প্রায় ৯০ বছর হয়েছিল।[২৫]

২৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/২১৬।

(২) শারীক ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আবী নুমাইর (شَرِيكُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي نُمَير): শারীক মদীনাবাসী মুহাদ্দিছ। তার দাদা আবূ নুমাইরকে ইবনু সা'দ ছাহাবী হিসেবে গণনা করেছেন, কিন্তু ইবনু আব্দিল বার্র করেননি।

শিক্ষকমণ্ডলী: আনাস, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, কুরাইব, 'আতা ইবনু ইয়াসার রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন।

ছাত্রবৃন্দ: তার থেকে ইমাম মালেক, সুলায়মান ইবনু বেলাল, আব্দুল আযীয আদ-দারাওয়ার্দী, ইসমাঈল ইবনু জা'ফর, আবূ যমরা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এমনকি বড়দের মধ্যে সাঈদ আল-মাক্বুরীও তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

মন্তব্য: ইবনু মাঈন ও নাসাঈ ليس به بأس বলেছেন, আবার কখনো ليس بالقوي বলেছেন। ইমাম মালেকের মতো ইমামেরা তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন, যদি একজন মযবুত রাবী তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, তাহলে তার হাদীছে কোনো সমস্যা নেই।

ওফাত: ১৪০ হিজরীর আগে।[২৬]

শব্দ বিশ্লেষণ:

بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ- এটি মূলত ظهريهم। লছ্ মুবালাগা ও তাকীদের জন্য আলিফ ও নূন বাড়ানো হয়েছে। যেমন- নাফসের (نفس) সাথে নাফসানী (نفساني), ছয়দাল (صيدل) এর সাথে ছয়দালানী (صيدلاني)।

فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ؟ –وجد শব্দের পরিচিত অর্থ পাওয়া। তবে আরবী ভাষায় মাছদার, বাব ও ছিলাহ পরিবর্তন হলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়।

وَجَدَ وِجْدَانًا - অর্থ হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া কোনো জিনিস পাওয়া।

وَجَدَ وُجُودًا - অর্থ হচ্ছে কোনো লক্ষ্য বা কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন করা।

وَجَدَ عَلَيَّ مَوْجِدَةً- অর্থ মনে কষ্ট পাওয়া বা অসন্তুষ্ট হওয়া। এই হাদীছে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

اللَّهُمَّ نَعَمْ- সাধারণত হ্যাঁ-সূচক জবাব দেওয়ার জন্য نعم শব্দটি যথেষ্ট। কিন্তু এখানে তার পূর্বে আল্লাহুম্মা যুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু প্রশ্নকারী ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই ও শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, তাই রাসূল ﷺ তার প্রশ্নের ধরনের ধারাবাহিকতায় আল্লাহর নাম স্মরণ করে আল্লাহকে সাক্ষী রেখেই উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহুম্মা কথাটি نعم এর পূর্বে যুক্ত করেছেন। আর এটিই প্রকৃত বালাগাত।

২৬. তাহযীবুল কামাল, ১২/৪৭৫।

অধ্যায় ও হাদীছের সাথে সম্পর্ক:

এই অধ্যায়ে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাদীছ বর্ণনার পদ্ধতি হিসেবে আরয-এর বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি এই হাদীছটি পেশ করেছেন। এই হাদীছে ছাহাবী যিমাম ইবনু ছা'লাবা রাযিয়াল্লা-হু আনহু প্রতিটি কথা নিজে থেকে বলেছেন, তারপর সেই কথার উপর স্বীকৃতি দিয়েছেন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আর এই ধরনটিকেই আরয বলা হয় তথা ছাত্র পড়বেন, শিক্ষক শুনবেন এবং স্বীকৃতি দিবেন।

ফিক্বহী ব্যাখ্যা:

কোন বছরে যিমাম ইবনু ছা'লাবা এসেছিলেন?

এই হাদীছে আলোচিত ঘটনাটি কখন ঘটেছে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, এটি ৫ম হিজরীতে ঘটেছে। আবার কেউ বলেছেন, এটি প্রতিনিধি আগমনের বছর ৯ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ ৯ম হিজরীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তার মতের পক্ষে কিছু দলীলও পেশ করেছেন। দলীলসমূহ নিম্নরূপ—

১. এই হাদীছের ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে- আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমাদেরকে অতিরিক্ত প্রশ্ন করার বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছিল। তাই আমরা চাইতাম মরুচারী বেদুঈনরা এসে সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করুক আর আমরা শিখি। আর এই নিষেধ করার বিষয়টি মূলত সূরা আল-মায়েদার ১০১ নম্বর আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা জানি যে, সূরা আল-মায়েদা ৫ম হিজরীরও অনেক পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এই হাদীছে বর্ণিত ঘটনা অবশ্যই ৫ম হিজরীর পরের ঘটনা হওয়ার কথা।

২. এই হাদীছে যিমাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তাদের কাছে গিয়েছিলেন। তাই তার ক্বওমের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হতে তিনি এসেছেন। আর আমরা জানি রাসূল ﷺ দাওয়াতী প্রতিনিধি পাঠানো শুরু করেছিলেন হুদায়বিয়ার সন্ধির পর।

৩. যিমাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু নিজেকে বানূ সা'দ গোত্রের বলে দাবি করেছেন। আর বানূ সা'দ গোত্র হুনায়নের যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলত, উক্ত ঘটনা ৯ম হিজরীতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৪. উক্ত ঘটনার সময় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা ও নিজে উপস্থিত ছিলেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা

মক্কা বিজয়ের পর মদীনায় হিজরত করেছিলেন। সুতরাং ঘটনাটি ৯ম হিজরীতে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।[২৭]

উট কি মসজিদের মধ্যে বাঁধা যাবে?

এই হাদীছের শাব্দিক ও বাহ্যিক অনুবাদ প্রমাণ করে যে, উটটি মসজিদের মধ্যে বাঁধা হয়েছিল। তবে আবূ নুয়াইম তার মুস্তাখরাজে যখন এই হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, তখন সেখানে ইবারতটি একটু ভিন্নতা পেয়েছে। فَأَنَاخَهُ ثُمَّ عَقَلَهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ তথা তিনি উটকে বসালেন, তাকে বাঁধলেন এবং তারপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন।[২৮]

এই ইবারতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হয়তো মসজিদের আঙিনায় বা এরিয়ায় উটটি বেঁধেছিলেন, মূল মসজিদে নয়। তবে মূল মসজিদেও উট বা অন্য কোনো প্রাণী প্রবেশ করলে সমস্যা নেই। রাসূল ﷺ-এর যুগে মসজিদে কুকুর প্রবেশ করেছে মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বর্ণনা করেছেন।[২৯] আর যে সমস্ত প্রাণীর গোশত হালাল, সে সমস্ত প্রাণীর পেশাব-পায়খানা অপবিত্র নয়। তবে মসজিদের সম্মানে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে এই ধরনের প্রাণী যেন মসজিদের মধ্যে না যায়। আর চলে গেলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করাই উত্তম।

হজ্জের উল্লেখ নেই কেন?

অনেকেই বলেছেন, তখন হজ্জ ফরয হয়নি, তাই হজ্জের উল্লেখ নেই। আবার কেউ বলেছেন, দ্বীনে ইবরাহীমের অংশ হিসেবে আরবের মানুষ পূর্ব থেকেই হজ্জ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাই জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়নি। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এই হাদীছের অন্য বর্ণনায় হজ্জের কথা উল্লেখ রয়েছে।[৩০]

রাসূল ﷺ-এর গায়ের রং কি সাদা?

এই হাদীছে রাসূল ﷺ-কে সাদা রঙের মানুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে রাসূল ﷺ-এর গায়ের রং সংক্রান্ত যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সকল হাদীছের সারমর্ম অনুযায়ী রাসূল ﷺ ধবধবে ফ্যাকাসে সাদা ছিলেন না, বরং তিনি লালাভ সাদা রঙের মানুষ ছিলেন। আর তাঁর সাদা রং ছিল অতি উজ্জ্বল।[৩১]

২৭. ফাতহুল বারী, ১/১৫২।
২৮. ফাতহুল বারী, ১/১৫২।
২৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৪।
৩০. ছহীহ মুসলিম, হা/১২।
৩১. ছহীহ বুখারী, হা/২৫৪৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৪৭।

এই হাদীছের শিক্ষা বা সারমর্মসমূহ:

১. হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম/নেতা অনুসারীদের মাঝে বসতে পারেন, এমনকি হেলানও দিতে পারেন।

২. আরও প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ অত্যন্ত নিরহংকার ছিলেন। তিনি লোকদের মাঝেই ছিলেন, তাঁর জন্য আলাদা রাজসিংহাসন ছিল না।

৩. জানার জন্য প্রশ্ন করা যায়।

৪. একজন দাঈ যেকোনো প্রশ্ন ও পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন। তাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। যেমন- আমাদের নবী ﷺ উক্ত হাদীছের প্রতিটি পরিবেশে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

৫. শরীআতের মৌলিক বার্তা অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

সম্পাদকীয়োর বাকি অংশ

৪. হত্যা ও মারামারি: ক্ষমতার নেশায় যখন মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। ক্ষমতা আফিমের মতো। ক্ষমতার নেশায় আসক্ত মানুষ ক্ষমতার জন্য মানুষকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। ফলে যেকোনো নির্বাচনের আগে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের জেরে অসংখ্য খুনাখুনি ও মারামারি হয়। অথচ মানুষ হত্যা পৃথিবীর অন্যতম মহাপাপ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে কেউ একজন মানুষকে হত্যা করে... সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল' *(আল-মায়েদাহ, ৫/৩২)*। রাসূল ﷺ বলেন, 'একজন মুসলিমকে হত্যা করার চেয়ে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে কম গুরুতর' *(তিরমিযী, হা/১৩৯৫)*।

উপরের চারটি বৈশিষ্ট্য সাধারণত গোলামদের বৈশিষ্ট্য। ক্রীতদাস বা গোলামেরা একটি রুটির জন্য মারামারি থেকে হত্যা পর্যন্ত করে থাকে। ক্রীতদাসকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া যায়। তারা সামান্য টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায়। মিথ্যা বলা ও গীবত করা আত্মমর্যাদাহীন বেকার ও গোলামের মৌলিক কাজ। মুসলিম উম্মাহ যেন গোলামির এই স্বভাব থেকে কখনো মুক্তি না পায় এবং তাদের মধ্যে যেন কখনো প্রকৃত নেতৃত্ব তৈরি না হয় এই জন্য তাদের উপর গণতন্ত্রকে চাপিয়ে দেওয়া আছে। গণতন্ত্র হচ্ছে গোলাম তৈরির কারখানা। গণতন্ত্রের কবর রচনার উপরেই একদিন ইসলামী খেলাফতের উত্থান হবে ইনশাআল্লাহ। *(প্র. স.)*

শা‘বান মাসের গুরুত্ব ও প্রচলিত শবেবরাত

-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ

ভূমিকা:

শা‘বান হলো হিজরী বর্ষের ৮ম মাস, রামাযানের পূর্বে যার অবস্থান। রাসূল ﷺ প্রায় রামাযানের মতোই এ মাসকে গুরুত্ব দিতেন। কখনো কখনো পূর্ণ শা‘বান মাস ছিয়াম রাখতেন। শা‘বান ও রামাযান উভয়টিই গুরুত্ববহ ও ফযীলতপূর্ণ মাস। রামাযানের গুরুত্ব তো প্রায় আমরা সকলেই বুঝি, কিন্তু শা‘বান মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা অনেকেই বুঝার চেষ্টা করি না। শা‘বান মাসের গুরুত্ব অনুধাবন না করার কারণে অসংখ্য মানুষ এ মাসে শবেবরাতের মতো বিদআতী কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে, যা আদৌ রাসূল ﷺ নিজে করেননি এবং কাউকে করতে আদেশও করেননি। এ নিবন্ধে শা‘বান মাসের গুরুত্ব ও প্রচলিত শবেবরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

শা‘বান মাসের গুরুত্ব:

(১) শা‘বান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি বেশি ছিয়াম পালন করতে ভালোবাসতেন। তিনি সাধারণত এ মাসের অধিকাংশ দিন একটানা ছিয়াম পালন করতেন। তিনি এ মাসে ছিয়াম পালন করতে ছাহাবীগণকে উৎসাহ প্রদানও করতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُه أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রামাযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পূর্ণ মাস ছিয়াম রাখতে দেখিনি। আর আমি তাঁকে (রামাযান ছাড়া) শা‘বান মাস অপেক্ষা অধিক ছিয়াম রাখতে আর কোনো মাসে দেখিনি’।[৩২] আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীছে তিনি বলেন, كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ: شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ ‘ছিয়াম রাখার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় মাস ছিল শা‘বান মাস। তিনি এ মাসে ছিয়াম অব্যাহত রেখে তা রামাযানের সাথে যুক্ত করতেন’।[৩৩]

সুতরাং শা‘বান মাসের গুরুত্ব অনুধাবন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণে এ মাসকে ভালোবেসে বেশি বেশি ছিয়াম পালনের চেষ্টা করতে হবে।

(২) শা‘বান একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মাস, যে মাসে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِن شَعْبَانَ قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে শা‘বান মাসে যত ছিয়াম রাখতে দেখি, অন্য কোনো মাসে তো রাখতে দেখি না, (এর রহস্য কী?) উত্তরে তিনি বললেন, ‘এটা তো সেই মাস, যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন, যা রজব ও রামাযানের মাঝে। আর এটা তো সেই মাস, যাতে বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, ছিয়াম রাখা অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হোক’।[৩৪]

সুতরাং একাধিক ফযীলতের কারণে যেভাবে রামাযান মাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং পবিত্র মাস হিসেবে আশহুরে হুরুম বা পবিত্র চার মাসকে যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়, তেমনি সারা বছরের আমলনামা পেশ হওয়ার মাস হিসেবে শা‘বান মাসকেও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

প্রচলিত শবেবরাত:

শবেবরাতের পরিচিতি: হিজরী বর্ষের শা‘বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে ফারসীতে ‘শবেবরাত’ এবং আরবীতে ‘লায়লাতুল বারাআত’ (ليلة البراءة) বলা হয়। যার অর্থ নিষ্কৃতি বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত ‘সৌভাগ্য রজনি’ হিসেবেই পালিত হয়।

শবেবরাত উদযাপন করার শারঈ হুকুম: শবেবরাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো ইবাদত-বন্দেগী করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত, চাই তা বাড়িতে হোক বা মসজিদে হোক, একাকী হোক বা দলবদ্ধভাবে হোক। রাসূল ﷺ ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো প্রমাণ নেই যে, তারা নির্দিষ্টভাবে এ রাতে কোনো ইবাদত-বন্দেগী করতেন। সুতরাং এটি দ্বীনের মধ্যে একটি সংযোজিত বিদআত। যার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহর দলীল নেই এবং ছাহাবী-তাবেঈগণেরও ইজমা তথা সম্মিলিত কোনো সিদ্ধান্তও পাওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ বিশ্ববিখ্যাত ফক্বীহদের অভিমত:

১. হাফেয ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯৫ হিজরী) বলেন, অর্ধ শা‘বানের রাতে ছালাত আদায় করার ব্যাপারে নবী ﷺ ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো দলীল প্রমাণিত হয়নি। তবে শামের কয়েকজন ফক্বীহ এ রাতে কিছু ইবাদত-বন্দেগী করতেন

৩২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬৯।

৩৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৫৪৮; আবূ দাঊদ, হা/২৪৩১, হাদীছটি ছহীহ।

৩৪. মুসনাদে আহমাদ, হা/২১৭৫৩; নাসাঈ, হা/২৩৫৭; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১০০৮।

বলে তথ্য পাওয়া যায়।[৩৫]

২. বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী ইমাম আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ (মৃত. ১৪২০ হিজরী) বলেন, বর্তমানে প্রচলিত বিদআতসমূহের মধ্যে একটি হলো শা'বান মাসের মধ্যভাগে 'শবেবরাত' উদযাপন করা এবং ঐ দিন ছিয়াম পালন করা, যা কিছু সংখ্যক লোক ধর্মের মধ্যে নতুনভাবে চালু করেছে। অথচ শরীআতে এর স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো দলীল নেই। কেননা শবেবরাতের ফযীলত বর্ণনায় যে সকল দুর্বল হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, তার কোনোটির উপর নির্ভর করা চলে না। অতঃপর ঐ রাতের বিশেষ বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তা একেবারেই বানোয়াট'।[৩৬]

শবেবরাতের ফযীলত সম্পর্কে আমাদের সমাজে যতগুলো হাদীছ প্রচলিত আছে, সবই জাল ও যঈফ। শায়খ ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অর্ধ শা'বানের রাতের ফযীলতের ব্যাপারে কিছু দুর্বল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর উপর নির্ভর করা জায়েয নেই। আর এ রাতে ছালাত পড়ার ব্যাপারে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই জাল।[৩৭]

যেহেতু শবেবরাতে বিশেষ কোনো ইবাদত করার কথা বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাই এ রাতে বিশেষ কোনো ইবাদত করা, চাই তা একাকী হোক বা দলবদ্ধভাবে হোক, প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক- সর্বাবস্থায় তা বিদআত হিসেবে পরিত্যাজ্য হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যার ব্যাপারে আমার নির্দেশনা নেই, তা পরিত্যাজ্য'।[৩৮] আর ক্বিয়ামতের দিন বিদআতকারীর বাসস্থান হবে জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবায় বলতেন, وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ 'প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামে নিয়ে যাবে'।[৩৯]

শবেবরাত উপলক্ষ্যে প্রচলিত বিদআত:

(১) শবেবরাতের রাতে গুনাহ মাফের জন্য এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে ১০০ রাকআত ছালাত আদায় করা: ১০০ রাকআত ছালাত পড়ার পদ্ধতি হলো, প্রতি দুই রাকআত পর সালাম ফিরাতে হবে। প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহার পর ১০ বার সূরা ইখলাছ পাঠ করতে হবে। ১০০ রাকআত ছালাতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতে হয় মোট এক হাজার বার। তাই এ ছালাতকে 'ছালাতে আলফিয়া' বলা হয়।[৪০]

এই রাতে গুনাহ মাফের জন্য ১০০ রাকআত ছালাত সম্পর্কে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে, তা 'মাওযূ' বা জাল।[৪১]

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাতে ইবাদত করো এবং দিনে ছিয়াম পালন করো। কেননা আল্লাহ ঐদিন সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, কেউ কি আছ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কেউ কি আছ রূযী প্রার্থী, আমি তাকে রূযী দেব। কোনো রোগী আছ কি, আমি তাকে আরোগ্য দান করব?'[৪২]

আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি মাওযূ অথবা অত্যন্ত যঈফ। হাদীছটির সনদ 'অত্যন্ত দুর্বল (واه جدا)। তিনি বলেন, এর সনদে আবূ বকর ইবনু আবী সাবরাহ নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী।[৪৩]

এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মাক্বদিস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন- মিশকাতুল মাছাবীহ-এর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃ. ১০১৪ হি.) 'আল-লাআলী' কিতাবে বলেন, জুমআ ও ঈদায়েনের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতুল আলফিয়া' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর স্বপক্ষে যেসব হাদীছ ও উক্তি পেশ করা হয়, তার সবই জাল অথবা যঈফ। এই বিদআত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মাক্বদিস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করা, নেতৃত্ব দেওয়া এবং পেট পূর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদআতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেককার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহর গযবে যমীন ধসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন।[৪৪]

---

৩৫. হাফেয ইবনু রজব, লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃ. ১৪৫; শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ, আত-তাহযীর মিনাল বিদআহ, পৃ. ২৪।
৩৬. আত-তাহযীর মিনাল বিদআহ, পৃ. ২২।
৩৭. আত-তাহযীর মিনাল বিদআহ, পৃ. ২৩।
৩৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮।
৩৯. নাসাঈ, হা/১৫৮১; ইবনু মাজাহ, হা/৪৫, হাদীছ ছহীহ।
৪০. ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/২০৩।
৪১. ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূআত, ২/১২৭-২৯; ইমাম সুয়ূতী, আল-লাআলী আল-মাসনূ'আহ ফীল আহাদীছিল মাওযূআহ, ২/৪৯-৫০।
৪২. ইবনু মাজাহ, হা/১৩৮৮; মিশকাত, হা/১৩০৮।
৪৩. সিলসিলা যঈফা, হা/২১৩২।
৪৪. মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ (ব্যাখ্যা), হা/১৩০৮, পৃ. ৪/৪৪৬-৪৪৭।

(২) এ রাতে আগামী এক বছরের জন্য ভালোমন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়—এ ভ্রান্ত ধারণা করা: শবেবরাতে প্রতি বছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, ছহীহ হাদীছে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। নিছফে শা'বানকে এ নাম দেওয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ 'আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন'।[৪৫]

একদা আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে, তা ঘটবে- এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' অর্থাৎ পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না।[৪৬]

হাফেয ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ স্বীয় তাফসীরে বলেন, এ রাতে এক শা'বান হতে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা মুরসাল ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছসমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনিতেই লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হতে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলি তথা মৃত্যু, রিযিক্ব ও অন্যান্য ঘটনাবলি যা সংঘটিত হবে, সেগুলো লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এভাবেই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, মুজাহিদ, আবূ মালেক, যাহহাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হতে।

অতঃপর তাক্বদীর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হলো, ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ-وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ﴾ 'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ' *(আল-ক্বামার, ৫৪/৫২-৫৩)*।

আর পবিত্র কুরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে রামাযান মাসে ক্বদরের রজনিতে। শবেবরাতে কুরআন নাযিল হয় এ ধারণা পোষণ করা চরম ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ - فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ﴾ 'আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মোবারক রজনিতে, আমরা তো সতর্ককারী। এ রজনিতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' *(আদ-দুখান, ৪৪/৩-৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ 'নিশ্চয়ই আমরা এটা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে' *(আল-ক্বদর, ৯৭/১)*। আর ক্বদরের রাত্রি হলো রামাযান মাসে। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ﴾ 'এই সেই রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে' *(আল-বাক্বারা, ২/ ১৮৫)*।

(৩) হালুয়া-রুটি খাওয়া: শবেবরাত উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে হালুয়া-রুটি খাওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। শুধু তাই নয়, বরং সে দিন গরীব মানুষও টাকা ধার করে হলেও এক বেলা গোশত কিনে খায়। কারণ সেদিন যদি ভালো খাবার খাওয়া যায়, তাহলে নাকি সারা বছর ভালো খাবার খাওয়া যাবে। আর হালুয়া-রুটি খাওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়, ঐ দিন উহুদ যুদ্ধে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসেবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন, বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার সকালে।[৪৭] আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দুই মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে!

তিনি নরম খাবার কি শুধু একদিন খেয়েছিলেন? তাহলে এ কেমন ভালোবাসা? আপনি শা'বান মাসের ১৫ তারিখে কিছু হালুয়া-রুটি খেলেন, আবার কিছুক্ষণ পর গরুর গোশত তো ঠিকই চিবিয়ে চিবিয়ে ভক্ষণ করতে থাকেন! এটাই হলো এদের তথাকথিত ভালোবাসার নমুনা!

সুতরাং বুঝা গেল, শবেবরাত যেমন সুন্নাহ-বিরোধী, ঠিক তেমনি এ ধরনের মনগড়া কর্মকাণ্ডও সুন্নাহ-বিরোধী। ছহীহ হাদীছে যার কোনো অস্তিত্ব নেই।

(৪) ছবি ও মূর্তি তৈরি: শবেবরাত উপলক্ষ্যে দেখা যায় নানা রঙের ছবি-মূর্তি ও তৈরিকৃত মিষ্টান্নতে বাজার ছেয়ে যায়। অথচ ছবি-মূর্তি তৈরি করা ইসলামে হারাম। আবার আল্লাহর দেওয়া রিযিক নিয়ে এভাবে খেল-তামাশা!

(৫) মীলাদ ও যিকির: শবেবরাত উপলক্ষ্যে মসজিদ, খানকা ও দরগাসমূহে শুরু হয় মীলাদ মাহফিল। চলে মিষ্টি খাওয়ার ধুম, চলতে থাকে বিদআতী পন্থায় গরম যিকিরের মজলিস। এসব কাজ দ্বীনের মধ্যে বিদআত ছাড়া কিছুই নয়।

(৬) কবর যিয়ারত: এক শ্রেণির মানুষ এ রাতে গোরস্থান বা মাযার যিয়ারতে বের হয়। এমনকি কোথাও কোথাও এ প্রথাও দেখা যায় যে, একদল মানুষ এ রাতে ধারাবাহিকভাবে এলাকার সকল কবর যিয়ারত করে থাকে। তাদের দলীল হলো, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কালব' গোত্রের ছাগলসমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক

৪৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৩; মিশকাত, হা/৭৯।
৪৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৭৬; মিশকাত, হা/৮৮।
৪৭. ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৩৪৮।

সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন’।[৪৮]

অথচ মুহাদ্দিছগণ উক্ত হাদীছটিকে যঈফ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এর সনদ মুনকাত্বি‘ বা ছিন্নসূত্র এবং সনদে হাজ্জাজ ইবনে আরত্বাহ নামক একজন দুর্বল রাবী আছেন।[৪৯]

(৭) আলোকসজ্জা: শবেবরাত উপলক্ষ্যে রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি, মসজিদ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি আলোকসজ্জা করা হয়। মূলত, এসব কাজে একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ টাকা শুধু অপচয় করা হয়, তেমনি এটা অগ্নিপূজকদের সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ।

(৮) মৃতদের রূহ দুনিয়াতে পুনরাগমনের বিশ্বাস: পরিলক্ষিত হয় যে, এ রাতে অনেক মহিলা ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে আতর-সুগন্ধি লাগিয়ে পরিপাটি করে রাখে। বিশেষ করে বিধবা মহিলাগণ এমনটি করেন। এমনকি তারা কিছু খাবার এক টুকরো কাপড়ে পুরে ঘরে ঝুলিয়ে রাখেন। কারণ তাদের বিশ্বাস হলো, তাদের মৃত স্বামী-স্বজনদের রূহ এ রাতে ছাড়া পেয়ে নিজ নিজ পরিবারের সাথে দেখা করতে আসে। সেজন্য এ রাতে মূর্খ লোকজন মাগফিরাত কামনার জন্য দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যায়। এমনকি মহিলাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এটা যে কত বড় মূর্খতা, তা একমাত্র আল্লাহ জানেন!

মানুষ মারা গেলে তাদের রূহ বছরের কোনো একটি সময় আবার দুনিয়াতে ফিরে আসা— প্রকৃত মুসলিমের আক্বীদা হতে পারে না। তাদের দলীল হলো, আল্লাহ বলেন, ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ-سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ‘সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ নেমে আসেন তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি, ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/৪-৫)*। এখানে ‘সেই রাত্রি’ বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদরকে বুঝানো হয়েছে, শবেবরাতকে বুঝানো হয়নি।

আর সূরায় ‘রূহ’ অবতীর্ণ হয় কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতাদের নেতা জিবরীল আলাইহিস সালাম। কেননা ‘রূহ’ শব্দটি একবচন। তাফসীরে ইবনে কাছীরেও এমনটা বর্ণিত হয়েছে। অথচ অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলো সব দুনিয়ায় নেমে আসে, যা সঠিক নয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, দেশে প্রচলিত শবেবরাত সুস্পষ্ট বিদআত। শা‘বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোনো দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের খেলাফ অর্থাৎ বিদআত। অথচ এই শবেবরাত নামক বিদআত পালনে সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়, যা খুবই দুঃখজনক। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দার গুনাহ মাফ করা হয়, আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়, সারা বছরের ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়; যা চরম ভ্রান্ত ধারণা। শা‘বান মাসে ইবাদতের ব্যানারে শবেবরাতের নামে এ ধরনের বিদআতকে সমূলে উচ্ছেদ করা সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য।

প্রবন্ধ থেকে শিক্ষা:

১. রামাযানের আগের মাস হিসেবে শা‘বান মাসের প্রধান করণীয় হলো, অধিক হারে ছিয়াম পালন করা।

২. যারা ‘আইয়ামে বীয’ এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ শা‘বানে উক্ত নিয়্যতেই ছিয়াম পালন করতে পারবে, শবেবরাতের নিয়্যতে নয়।

৩. কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে রামাযানুল মোবারকের ক্বদরের রাতে, শা‘বানের ১৫ তারিখ বা শবেবরাতে নয়।

৪. সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমলের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া।

৫. শবেবরাত উপলক্ষ্যে শুধু ১৪ তারিখে ছিয়াম রাখার এবং ১৫ তারিখে রাত জেগে নফল ছালাত, মীলাদ, যিকির-আযকার ইত্যাদি পালন করা বিদআত।

৬. আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন।

৭. যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা নেই, তা পরিত্যাজ্য।

৮. প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহী তার অনুসারীকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

উপসংহার:

শা‘বান মাস রামাযানের পূর্ব প্রস্তুতির জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ মাস। এ মাসে বান্দার আমলনামা আল্লাহর কাছে উপস্থাপিত হয়। শা‘বান মাসের ছিয়ামকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রামাযানের মতোই গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু এ মাসকে গুরুত্ব না দিয়ে মানুষ শবেবরাত নামক বিদআতে লিপ্ত। এ মাসে এমন অসংখ্য বিদআতী কাজ হয়, যা ইসলাম সমর্থিত নয়। তাই সমাজে প্রচলিত সকল বিদআত সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করে জনসাধারণকে আলোচনার মাধ্যমে হুঁশিয়ার করতে হবে। আমাদের কর্তব্য হলো, সকল প্রমাণহীন অনুষ্ঠানাদি বর্জন করা এবং সঠিক দ্বীনের দিকে ফিরে আসা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল বিদআত ও গোমরাহী থেকে হেফাযত করুন- আমীন!

৪৮. ইবনু মাজাহ, হা/১৩৮৯; মিশকাত, হা/১২৯৯; যঈফুল জামে , হা/১৭৬১।
৪৯. আলবানী, যঈফুল জামে‘, হা/১৭৬১; শুআইব আরনাঊত্ব, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬০৬০।

রামাযানের আগমনে আমাদের প্রস্তুতি

-মো. আকরাম হোসেন

রামাযান—একটি মাস, অথচ শুধু একটি মাস নয়। এটি এক রুহানী বসন্ত, আত্মিক জাগরণের এক স্বর্ণসময়, যখন মানুষের হৃদয় নতুন আলোয় ভরে ওঠে, আর মুমিনের আত্মা ডানা মেলে আকাশের দিকে তাকায়। ১২ মাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রামাযান যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া এক বিশেষ উপহার, যা আসে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযান মাসের ব্যাপারে যে হাদীছ শুনিয়েছেন, যেখানে দুষ্ট জিন ও শয়তানকে শিকলবন্দি করে দেওয়া হয়, জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে রাখা হয় আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়[৫০]—এই সংবাদই যেন মুমিনের হৃদয়ে এক অনাবিল উচ্ছ্বাস জাগায়। প্রথম রাত থেকেই এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা মুমিনকে স্বাগত জানায়, টেনে নিয়ে যায় আলোর দিকে, দয়ার দিকে, মুক্তির দিকে। রামাযানের এই মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারলেই স্পষ্ট হয় যে, এত বড় নেয়ামতকে বরণ করতে প্রস্তুত হওয়া কতটা জরুরী।

রামাযানের প্রস্তুতি আসলে শুরু হয় অন্তর থেকে। কালিমাযুক্ত হৃৎপিণ্ড, গোনাহে ভারাক্রান্ত আত্মা, অহংকার ও হিংসায় জড়ানো মন নিয়ে রামাযানে প্রবেশ করা মানে যেন নোংরা পোশাক পরে রাজদরবারে প্রবেশ করা। রামাযানের জন্য প্রস্তুতি মানে নিজের অন্তরকে পরিষ্কার করা, মনের কালিমা ধুয়ে ফেলা, অপরাধবোধকে তওবার অশ্রুতে গলিয়ে দেওয়া। মনকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করা দরকার, যেন আল্লাহর আমন্ত্রণ শুনলেই তা সাড়া দিতে পারে, যেন ফজরের আযানে ঘুম ভেঙে যায়, যেন ইফতারের মুহূর্তে চোখ ভিজে ওঠে কৃতজ্ঞতায়, যেন ক্বিয়ামুল লায়লের রাতে চিন্তা ফুলের মতো ফুটে ওঠে। নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ না করলে রামাযান আসে যায় কিন্তু মানুষের ভেতরে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাই দৃঢ় নিয়্যতই রামাযানের প্রস্তুতির প্রথম ধাপ।

সুস্থ দেহও রামাযানের ইবাদতে বড় সহায়। নির্জীব শরীর ইবাদতের ভার বহন করতে পারে না। রামাযানের দীর্ঘ ছিয়াম, তারাবীহর ছালাতে দাঁড়ানো এবং কুরআন তেলাওয়াতে সময় ব্যয় করার জন্য শক্তি ও মানসিক প্রশান্তি প্রয়োজন। তাই শা'বানের সময়েই শারীরিক যত্ন নেওয়া জরুরী। খাদ্যাভ্যাস কিছুটা ঠিক করা, অতিরিক্ত রাত জাগা কমানো, ঘুমের সুষমতা ফিরিয়ে আনা এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াও এই প্রস্তুতির অংশ। রামাযান এক বিশাল সমুদ্র। সেই সমুদ্রে নামার আগে শক্তি ও প্রাণশক্তিকে সঠিকভাবে গুছিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

রামাযান হলো কুরআনের মাস। তাই রামাযানের প্রস্তুতিতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি হলো কুরআনকে নিজের জীবনে ফিরিয়ে আনা। আগামী রামাযানে খতম করার ইচ্ছা থাকলে এখন থেকেই কুরআন হাতে নেওয়া উচিত। তাফসীর পড়া, আয়াতের অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করা এবং অন্তরে তা ধারণের চেষ্টা করা এসব প্রস্তুতি রামাযানের তেলাওয়াতকে মধুর করে তোলে। পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য ছিয়ামের মাসায়েল জানা, হালাল ও হারাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া, দু'আ ও যিকির শিখে রাখা এগুলোও প্রস্তুতির অংশ। কারণ ছহীহ জ্ঞান ছাড়া আমল কখনো পূর্ণতা পায় না।

রামাযানে সময় অমূল্য। প্রতিটি সেকেন্ড যেন নেকীর সুযোগ। কিন্তু পরিকল্পনা না থাকলে মানুষ সময় হারিয়ে ফেলে, কখনো খাবারে, কখনো ঘুমে, আবার কখনো আড্ডায়। তাই রামাযানের আগে নিজস্ব লক্ষ্য ঠিক করা উচিত। কীভাবে সময় ব্যয় করব, কোন কাজগুলো বাড়াবো, কোনগুলো কমাবো, কী পরিমাণ দান করব, কতটুকু কুরআন পড়ব—এসব পূর্বনির্ধারণ রামাযানকে ফলপ্রসূ করে তোলে। মুমিনের জীবন কোনো বিশৃঙ্খল সার্কাস নয়; বরং উচ্চ লক্ষ্য ও শৃঙ্খলার এক সুন্দর পথচলা। রামাযান সেই পথচলাকে আরও পরিপাটি করার মাস।

পরিবারও রামাযানের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদি ঘরে ইবাদতের বাতাবরণ তৈরি হয়, তাহলে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই এতে উৎসাহ পায়। ঘরে কুরআনের আসর বসানো, পরিবারের সবাইকে নিয়ে ইবাদত করা, সরল ইফতারী করা,

বাকি অংশ ৩৬ নং পেজে...

৫০. নাসাঈ, হা/২০৯৭, হাদীছ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৩০৭।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

-আব্দুল মোমিন তাজেমুল হক

ভূমিকা:

মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও পবিত্র বন্ধন হলো পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক শুধু রক্তের নয়; বরং ভালোবাসা, দায়িত্ব ও আত্মত্যাগের অমূল্য বন্ধনে গঠিত। ইসলাম এই সম্পর্ককে অত্যন্ত মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। পিতামাতা সন্তানের প্রথম শিক্ষক এবং তাদের দ্বারাই সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়। তাই ইসলামে সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু পারিবারিক বা সামাজিক নয়; বরং এটি এক গভীর ধর্মীয় দায়িত্বও বটে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সন্তানকে ইসলামী আদর্শে আদর্শবান করতে পারলে তার মর্যাদা কেমন হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই হাদীছটি— ‘জনৈক ব্যক্তিকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করা হলে সে অবাক হয়ে বলবে, এমন মর্যাদা কোন আমলের বিনিময়ে পেলাম? আমি তো এত সৎ আমল করিনি। বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের দু‘আর কারণেই তোমাকে এ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে’।[৫১] অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে, ‘নিশ্চয়ই তোমার সন্তানেরও তোমার উপর হক্ব রয়েছে’।[৫২]

নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি সন্তানসন্ততিকেও বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর’ *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*।

সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পিতামাতার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, সেগুলো পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

তার আগে একটি হাদীছ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কারণ আমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তাই আমাদের সন্তানদের হিসাবও আমাদের দিতে হবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর রক্ষক, একজন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রক্ষক, একজন নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের রক্ষক। এ ব্যাপারে তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক আর তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীন লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে’।[৫৩] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ‘মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ব্যতীত— চলমান ছাদাক্বা, এমন জ্ঞান যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দু‘আ করে’।[৫৪]

একজন প্রকৃত সন্তান গড়তে হলে বিবাহের পূর্ব থেকেই কিছু বিষয়ের মাধ্যমে তা করতে হবে। সেই বিষয়গুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব, ইনশা-আল্লাহ!

১. সন্তানের জন্য একজন ভালো পিতা/মাতা নির্বাচন করা: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ‘নারীকে চার কারণে বিবাহ করা হয়— সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারিতা। অতএব, তুমি দ্বীনদার নারীকে গ্রহণ করো, এতে তোমার কল্যাণ নিহিত’।[৫৫]

২. দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা না করা: এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা সন্তানকে গর্ভেই নষ্ট করে ফেলেন। এ ধরনের কাজ কোনোভাবেই করা যাবে না। এটি স্পষ্ট হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ ‘দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকেও এবং তাদেরকেও রিযিক্ব প্রদান করি’ *(আল-আনআম, ৬/১৫১)*।

৫১. মুসনাদে আহমদ, হা/১০৬১৮; ইবনু মাজাহ, হা/৩৬৬০।
৫২. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।
৫৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫২০০।
৫৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১।
৫৫. ছহীহ বুখারী, হা/৪৮০২।

৩. সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই তার কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা উচিত: বাবা-মা বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করবেন, কারণ সন্তান মায়ের গর্ভেই বাবা-মায়ের ভাষা এবং আচার-আচরণের প্রভাব গ্রহণ করতে শুরু করে। তাই এ সময়ে কুরআনের শব্দ ও দু'আয় পরিবেষ্টিত থাকা সন্তানের জন্য কল্যাণ ও শান্তির কারণ হয়ে ওঠে। গর্ভস্থ সন্তানের কল্যাণের দু'আ হলো, ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎ সন্তান দান করো' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০০)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শ বানাও' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৭৪)*।

৪. নবজাতকের কানে আযান দেওয়া: সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই ডান কানে আযান দিতে হবে।

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

আবূ রাফে' রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর পুত্র হাসান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কানে ছালাতের আযানের মতো আযান দিতে দেখেছি, যখন ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা তাকে জন্ম দেন।[৫৬]

৫. তাহনীক করা: কোনো আলেমের মাধ্যমে তাহনীক করাতে হবে (নবজাতকের মুখে চিবানো খেজুর ঘষে দেওয়া)।

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ بِابْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ حَنَّكَهُ بِهَا.

আসমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি আমার শিশুকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনলাম। তিনি তাকে কোলে নিলেন, খেজুর নিয়ে চিবালেন এবং তা দিয়ে শিশুর মুখে তাহনীক করলেন।[৫৭]

৬. সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা: নামের মধ্যে রয়েছে এক বিশেষ শক্তি— যা মানুষের চরিত্র, মানসিকতা ও জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই ইসলাম সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে, কারণ একটি ভালো নাম কেবল একটি পরিচয় নয়; বরং এটি দু'আ ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। হাদীছে এসেছে, إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান'।[৫৮]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থহীন ও অশুভ নাম পরিবর্তন করতেন। যেমন- 'আব্দুল উযযা' নাম পরিবর্তন করে 'আব্দুল্লাহ', 'আছিয়া' পরিবর্তন করে 'জামীলা' এবং 'বাররা' পরিবর্তন করে 'যায়নাব' রেখেছেন। ইবনুল মুসায়্যাব রহিমাহুল্লাহ বলেন, তার পিতার নাম ছিল 'হাযন' (কঠিন)। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামটি পরিবর্তন করে 'সাহল' (সহজ) রাখতে চাইলেও তিনি রাজি হননি। পরে তিনি বলেন, আমাদের পরিবারে এরপর থেকে সর্বদা কঠিন অবস্থা ও কষ্ট লেগেই থাকত।[৫৯]

৭. আক্বীক্বা করা: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার কারণে বন্ধকস্বরূপ থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু কুরবানী করতে হবে, মাথার চুল মুণ্ডন করতে হবে এবং নাম রাখতে হবে'।[৬০]

৮. খাতনা করানো: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ 'স্বভাবজাত বিষয় পাঁচটি— খাতনা, গোপনাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা এবং গোঁফ ছোট করা'।[৬১]

৯. তাওহীদ ও রিসালাতের শিক্ষা দেওয়া: এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। সন্তান যখন অল্প অল্প করে কথা শিখতে শুরু করবে, তখনই তার অন্তরে রিসালাত তথা আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মা'বূদ নেই— একথা শিক্ষা প্রদান করতে হবে এবং সাথে একথাও শিক্ষা দিতে হবে যে, সকল প্রকার ইবাদত তাঁরই নিমিত্তে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ 'তোমার প্রতিপালক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদত করবে না' *(আল-ইসরা, ১৭/২৩)*।

১০. কুরআন শিক্ষা দেওয়া: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে কুরআন শিখে এবং তা শিক্ষা দেয়'।[৬২]

১১. দ্বীন শিক্ষা দেওয়া: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয'।[৬৩]

১২. ছালাত শিক্ষা দেওয়া: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ 'তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে ছালাতের জন্য নির্দেশ দাও।

৫৬. তিরমিযী, হা/১৫৫৩।
৫৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৬৭।
৫৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২১৩২।
৫৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৯০।
৬০. আবূ দাঊদ, হা/২৮৩৮।
৬১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৯।
৬২. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭।
৬৩. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪।

যখন তাদের বয়স ১০ বছর হয়ে যাবে, তখন (ছালাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দাও’।[৬৪]

১৩. উত্তম আদব শিক্ষা দেওয়া: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا نَحْلًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ ‘পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদবের চেয়ে উত্তম কিছু দান করেনি’।[৬৫]

১৪. ধৈর্য শিক্ষা দেওয়া: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ ‘হে আমার ছেলে! ছালাত ক্বায়েম করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখো এবং যা তোমার উপর আপতিত হয়, তাতে ধৈর্যধারণ করো’ *(লুক্বমান, ৩১/১৭)*।

১৫. শিরক থেকে দূরে রাখা: কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ‘হে আমার ছেলে! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক বড় যুলম’ *(লুক্বমান, ৩১/১৩)*।

১৬. সত্যবাদিতা শিক্ষা দেওয়া: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ‘সত্যবাদিতার উপর অটল থাকো, কেননা সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে’।[৬৬]

১৭. অন্যায় থেকে বিরত রাখা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘অন্যায় থেকে বেঁচে থাকো, কেননা অন্যায় ক্বিয়ামতের দিনে অন্ধকারে পরিণত হবে’।[৬৭]

১৮. ভালো বন্ধু নির্বাচন করতে শেখানো: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ‘মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে। তাই তোমাদের প্রত্যেকে খেয়াল করুক, সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে’।[৬৮]

১৯. হালাল উপার্জন শেখানো: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ‘তোমাদেরকে আমি যে উত্তম বস্তু দ্বারা রিযিক্ব দিয়েছি, তা থেকে খাও’ (আল-বাক্বারা, ২/১৭২)।

২০. নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ‘আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্য’।[৬৯]

২১. কন্যাসন্তানকে হিজাব শিক্ষা দেওয়া: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ ‘হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের উপর টেনে নেন’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)*।

২২. খেলাধুলায় উৎসাহ দেওয়া: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كُلُّ مَا لَهْوٍ يَلْعَبُ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيُهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ ‘মানুষের সব ধরনের খেলাধুলা অর্থহীন; তবে তির-ধনুক চালনা, ঘোড়া প্রশিক্ষণ এবং পরিবারের সাথে খেলা ব্যতীত’।[৭০]

২৩. দু‘আ শিক্ষা দেওয়া: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ‘আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব’ *(গাফির, ৪০/৬০)*।

২৪. গীবত থেকে বিরত রাখা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ ‘তোমাদের কেউ যেন অন্য কারো গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে?’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)*।

২৫. আল্লাহভীতি শিক্ষা দেওয়া: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যতটুকু পার’ (আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)।

২৬. সন্তানের জন্য দু‘আ করা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾ ‘হে আমার রব! আমাকে ছালাত ক্বায়েমকারী করো এবং আমার সন্তানের মধ্য থেকেও’ (ইবরাহীম, ১৪/৪০)।

উপসংহার:

সন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক আমানত। তাদেরকে সঠিকভাবে লালনপালন করা, দ্বীন ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া, চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা— এগুলো পিতামাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শুধু খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় প্রদান নয়; বরং তাদের হৃদয়ে ঈমান, তাক্বওয়া ও সৎচরিত্রের বীজ রোপণ করাই প্রকৃত দায়িত্ব পালন।

যদি পিতামাতা সন্তানের ইহকাল ও পরকাল উভয়ের কল্যাণের প্রতি যত্নবান হন, তবে সেটিই তাদের জন্য ছওয়াব ও দুনিয়া-আখেরাতের সাফল্যের পথ খুলে দেয়। তাই আমাদের উচিত সন্তানকে দুনিয়ায় নয়, আখেরাতের সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৬৪. আবূ দাঊদ, হা/৪৯৫।
৬৫. তিরমিযী, হা/১৯৫২।
৬৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৯৪।
৬৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৮।
৬৮. তিরমিযী, হা/২৩৭৮।
৬৯. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৬১৪।
৭০. তিরমিযী, হা/১৬৩৭।

নতুন বছর ২০২৬ ও সময়ের সদ্ব্যবহার

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

নতুন বছর মানেই মানুষের জীবনে নতুন সম্ভাবনা, নতুন লক্ষ্য এবং নতুন আত্মপ্রত্যয়। ২০২৬ সালের সূচনায় আমরা শুধু সংখ্যার পরিবর্তনই দেখতে পাই না; বরং এটি আমাদের জন্য আত্মসমীক্ষা, নৈতিক উন্নতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ হিসেবেও বিবেচিত। ইসলামে সময়কে অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে দেখা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ﴿وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

‘সময়ের কসম! নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে’ *(আল-আছর, ১০৩/২-৩)*।

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোই প্রকৃত নৈতিক জীবন গঠনের মূল চাবিকাঠি। নতুন বছরের শুরু আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা কেমন ব্যবহার করেছি পূর্ববর্তী সময়কে এবং কেমন ব্যবহার করব আগামীর জন্য।

আত্মসমীক্ষা ও তওবার গুরুত্ব:

ইসলামে প্রতিটি মুহূর্তই আত্মসমীক্ষা ও তওবার সুযোগ। নবী ﷺ বলেছেন,كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ ‘মানুষ মাত্রই গুনাহগার (অপরাধী)। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারীরাই উত্তম’।[৭১] ২০২৬ সালের সূচনায় আমরা যদি নিজের আচরণ, ভুলত্রুটি ও অপরাধগুলো বিশ্লেষণ করি, তবে তা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ খুলে দেয়। ভুল স্বীকার করা এবং তওবা করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ ‘আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা কর, তা তিনি জানেন’ (আশ-শূরা, ৪২/২৫)। নতুন বছরকে আমরা নিজেদের অতীত সংশোধনের এবং ভবিষ্যতকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করার একটি সুযোগ হিসেবে দেখতে পারি।

৭১. তিরমিযী, হা/২৪৯৯, ‘হাসান’।

সময়ের সদ্ব্যবহার ও জীবনের লক্ষ্য:

ইসলামে সময়কে নষ্ট না করে কাজে লাগানোর গুরুত্ব বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ‘এমন দুটি নিয়ামত আছে, যে দুটোতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে—সুস্থতা আর অবসর’।[৭২] নতুন বছরে আমরা যদি প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর রাস্তায় বিনিয়োগ করি—নিয়মিত ছালাত, যিকির, দান এবং সৎ কর্ম—তবে আমাদের জীবন অর্থপূর্ণ হবে। ইসলাম আমাদের শেখায় যে, সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব:

নতুন বছর শুধুই ব্যক্তিগত উন্নতি নয়; সামাজিক দায়িত্বের উপলক্ষ্যও। নবী ﷺ বলেছেন, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ সে, যে মানুষদের অধিক উপকারে আসে।[৭৩] ২০২৬ সালে আমরা যদি মানুষের কল্যাণে, দাতব্য কাজে এবং সহমর্মিতায় মনোযোগ দিই, তাহলে কেবল ব্যক্তিগত নয়; সামাজিক জীবনও উন্নত হবে। নতুন বছরকে সেবা, সহমর্মিতা এবং ন্যায়পরায়ণতার বছর হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা:

নতুন বছর মানেই নতুন লক্ষ্য নির্ধারণের সময়। ইসলামে লক্ষ্য স্থাপনকে গুরুত্বপূর্ণ ধাপে দেখা হয়েছে, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ‘অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন করো, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু’ (আল-বাক্বারা, ২/১৯৯)। ২০২৬ সালের জন্য আমাদের উচিত এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করা, যা আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করে। নিয়মিত ছালাত, দান, সৎ আচরণ এবং পাপ থেকে বিরত থাকা—এই সব লক্ষ্য আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

বাকি অংশ ৩৩ নং পেজে...

৭২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১২।

৭৩. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২৬২৩।

সমাগত মহিমান্বিত রামাযান: স্বাগত জানানোর পদ্ধতি

মূল: মুহাম্মাদ আস-সাইয়িদ
অনুবাদ: শুআইব বিন আহমাদ

রামাযান মাস মুসলিম উম্মাহর জীবনে এক অনন্য ও অতুলনীয় বরকতময় সময়। এটি এমন একটি পবিত্র মাস, যে মাসকে আল্লাহ তাআলা সকল মাসের উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। এই মাসেই মানবজাতির জন্য হেদায়াতের দিশারী কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জীবনব্যবস্থা, নৈতিকতা ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের পথনির্দেশনা প্রদান করে। রামাযান শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম নয়; বরং এটি আত্মশুদ্ধি, তাক্বওয়া অর্জন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক মহামূল্যবান সুযোগ। -***অনুবাদক***

রামাযান মাসকে যেভাবে স্বাগত জানাবেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য মাসের তুলনায় রামাযান মাসকে একটু ভিন্নভাবে স্বাগত জানাতেন। রামাযান মাসকে তিনি এবং ছাহাবায়ে কেরাম খুবই গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযান মাসের আগমনে ছাহাবায়ে কেরামকে এভাবে সুসংবাদ জানাতেন,

أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

‘তোমাদের নিকট রামাযান মাস সমাগত হয়েছে। এটা একটি বরকতপূর্ণ মাস। আল্লাহ তাআলা এ মাসে তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যে তার কল্যাণ হতে বঞ্চিত হলো, সে অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হলো’।[৭৪]

ছাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم -এর মাঝেও এ মাসের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। রামাযান মাসকে পাওয়ার আশায় পূর্বের ছয় মাস তারা দু‘আ করতেন এবং এই মাসের আমলগুলো কবুল হওয়ার জন্য পরবর্তী ছয় মাস আল্লাহ তাআলার নিকট ফরিয়াদ জানাতে থাকতেন। সালাফে ছালেহীন দু‘আ ও অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে এ মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। কারণ রামাযান মাস হলো বরকতের মাস, কুরআনের মাস, জান্নাতের দরজা খোলার মাস, জাহান্নামের দরজা বন্ধের মাস এবং শয়তানকে রুদ্ধ করার মাস। রামাযান মাসের ফযীলতের অন্যতম দিক হলো এটি ছিয়াম, তাহাজ্জুদ, জিহাদ ও দু‘আর মাস। এজন্য একজন মুসলিমের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো এ বরকতপূর্ণ মাসকে স্বাগত জানানোর পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং নিজেকে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করা। নিম্নে এমন কিছু আমল তুলে ধরা হলো, যা দ্বারা একজন মুসলিম রামাযান মাসকে স্বাগত জানাতে পারে। তা হলো—

(ক) রামাযান মাসের আগমনে আনন্দিত এবং খুশি হওয়ার মাধ্যমে: একজন সৎ ব্যক্তি কল্যাণকর বা ইবাদতের মৌসুমে আনন্দিত হয় এবং তা সুসংবাদস্বরূপ গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذا ما أُنزِلَت سورَةٌ فَمِنهُم مَن يَقولُ أَيُّكُم زادَتهُ هـٰذِهِ إيمـٰنًا فَأَمَّا الَّذينَ آمَنوا فَزادَتهُم إيمـٰنًا وَهُم يَستَبشِرونَ﴾

‘আর যখনই কোনো সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি করল? আসলে যেসব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করছে’ *(আত-তাওবা, ৯/১২৪)*।

রামাযান মাসকে ঐ সব বরকতপূর্ণ সময়ের মাঝে গণ্য করা হয়, যে সময়ে বান্দা তার রবের দিকে ফিরে আসতে পারে এবং পাপী তার পাপ হতে বিরত থাকতে পারে। এসময়ে বান্দার আগমনে মসজিদগুলো ভরপুর হয়ে যায়। ফলে মুমিনের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। পবিত্র আত্মা প্রফুল্ল হয় তার রবের সান্নিধ্যে।

(খ) রামাযান মাসকে আল্লাহ তাআলার হামদ ও শুকরিয়া দ্বারা গ্রহণ করার মাধ্যমে: বরকতপূর্ণ রামাযান মাস পাওয়া এবং ছিয়াম সাধনায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারা বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত। তাই

৭৪. ছহীহুল জামে‘, হা/৫৫।

বান্দার উচিত হলো, বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। ছিয়ামের ফযীলতের ব্যাপারে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, দুজন ব্যক্তি বালিঈ নামক গ্রাম থেকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তারা ছিলেন খাঁটি মুসলিম। তাদের একজন ছিলেন অপরজন অপেক্ষা শক্তিধর মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হলেন এবং অপরজন এক বছর পর মারা গেলেন। তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত এবং আমি তাদের সাথে আছি। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এলেন এবং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়েছিলেন, তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি পুনরায় বের হয়ে এসে শহীদ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। পরে তিনি আমার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি চলে যাও। কেননা তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) সময় এখনও হয়নি, তোমার পালা পরে। সকাল বেলা তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু উক্ত ঘটনা লোকদের নিকট বর্ণনা করলেন। তারা এতে বিস্ময়াভিভূত হলেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে গেল এবং তারাও তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, 'কী কারণে তোমরা বিস্মিত হলে?' তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই ব্যক্তি তাদের দুজনের মধ্যে অধিকতর শক্তিধর মুজাহিদ। তাকে শহীদ করা হয়েছে। অথচ অপর লোকটি তার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকেনি?' তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'সে একটি রামাযান মাস পেয়েছে, ছিয়াম রেখেছে এবং এক বছর যাবৎ এই এই ছালাত কি সে পড়েনি?' তারা বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আসমান-যমীনের মাঝে যে ব্যবধান রয়েছে, তাদের দুজনের মধ্যে রয়েছে তার চেয়ে অধিক ব্যবধান'।[৭৫]

(গ) নিয়্যতকে ইখলাছপূর্ণ করার মাধ্যমে: রামাযান মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য নিয়্যতকে নবায়ন করা এবং এ মাসের সময়গুলো কাজে লাগানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এটা হতে পারে ইবাদতকে আঁকড়ে ধরা, সকল প্রকার পাপাচার থেকে বিরত থাকা, অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখা এবং সত্যিকারার্থে তওবা করার মাধ্যমে। বিশেষ করে (নিয়্যতের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ) আল্লাহ তাআলা নিয়্যত অনুযায়ী বান্দাকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى 'সমুদয় কার্যাবলি নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে নিয়্যত করে'।[৭৬]

(ঘ) রামাযানের আগমনে অগ্রিম প্রস্তুতি গ্রহণ করার মাধ্যমে: এটা নাফসকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ইবাদতের (যেমন- ক্বিয়ামুল লায়ল, ছিয়াম, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি) জন্য অভ্যস্ত করে তোলার অন্যতম মাধ্যম। এমনভাবে নাফসের প্রস্তুতি পরিপূর্ণ করা যে, নাফস যেন কোনো রকমের কষ্ট বা ক্লান্তি ছাড়াই রামাযানের ইবাদত সম্পন্ন করতে পারে। সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানের প্রস্তুতি স্বরূপ শা'বান মাসের অধিকাংশ দিনেই ছিয়াম পালন করতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِن شَهْرٍ قَطُّ، أَكْثَرَ مِن صِيَامِهِ مِن شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا 'আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শা'বান মাসের চেয়ে অন্যান্য মাসে বেশি (নফল) ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। তিনি শা'বান মাসের কিছুদিন বাদে পুরো মাসই ছিয়াম রাখতেন'।[৭৭]

(ঙ) খাঁটি তওবার মাধ্যমে: প্রত্যেক অবস্থায় বা সময় তওবা করা আবশ্যক, বিশেষত বান্দার যেকোনো পাপকর্ম সংঘটিত হলে। তবে রামাযান মাসের ক্ষেত্রে তওবা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রামাযান মাস হলো কল্যাণ ও ইবাদতের মৌসুম। বাস্তবিকভাবে অবাধ্য আচরণ এবং পাপকর্মকে ইবাদতের তাওফীক্ব না পাওয়ার কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে ব্যক্তি রবের নৈকট্যশীল হওয়ার তৃপ্তি লাভ করতে পারে না এবং আল্লাহ তাআলার আদেশসমূহ পালন করতে ব্যর্থ হয়। হাসান আল-বাছরী রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, আমি ক্বিয়ামুল লায়ল করতে পারছি না। তিনি বললেন, তোমার কৃত পাপ তোমাকে বাধাগ্রস্ত করছে। সালাফদের মাঝে কেউ কেউ বলতেন, আমি কোনো একটি পাপকর্ম সম্পাদন করার দরুণ এক বছর ক্বিয়ামুল লায়ল থেকে বঞ্চিত হয়েছি। ফুযাইল ইবনে ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন তুমি ক্বিয়ামুল লায়ল করতে ব্যর্থ হবে, দিবসের ছিয়াম পালনে সক্ষম হবে না, তখন বুঝে নিয়ো যে, নিশ্চয় তুমি বাধাগ্রস্ত, তোমার পাপ তোমাকে আটকে রেখেছে। এজন্যই নবায়নকৃত তওবা ও তার শর্তসমূহ ভালোভাবে লক্ষ করার মাধ্যমে রামাযান মাসকে স্বাগত জানানো উচিত। তওবার শর্তসমূহ হলো— কৃত পাপকর্মের বিষয়ে লজ্জিত হওয়া, পুনরায় পাপকর্ম সম্পাদন না করা, অধিকারী বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার হক্ব ফিরিয়ে দেওয়া, বেশি বেশি ইস্তিগফার করা এবং তওবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রবের তরে অনবরত দু'আ করা।

৭৫. ইবনু মাজাহ, হা/৩৯২৫, হাদীছটি ছহীহ।

৭৬. ছহীহ বুখারী, হা/১।

৭৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬।

(চ) সময়ের মূল্য জানার মাধ্যমে: অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়ে যায় তার মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে। এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো সৎ আমলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সেকেন্ডকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা রামাযান মাসকে (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ) 'হাতে গোনা কয়েকটা দিন' বলে বিশেষায়িত করেছেন। উক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রামাযানের সময়গুলো খুবই মাহাত্ম্যপূর্ণ; তবে এর দিবস সংখ্যা কম ও দ্রুত চলমান। সুতরাং এ মাসকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, যেন রামাযান মাস দিবাগত হওয়ার পর সময় নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আফসোস না হয়।

(ছ) খাবার কম গ্রহণ করার মাধ্যমে: মাত্রাতিরিক্ত খাবার গ্রহণ ইবাদাতের ক্ষেত্রে অলসতা ও উদাসীনতার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। অপরদিকে অল্প খাবার গ্রহণ হলো ছিয়ামের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। মাত্রাতিরিক্ত খাবার গ্রহণ নিন্দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোনো একজন ব্যক্তি ঢেকুর তুললে তিনি বলেন, كُفَّ جشاءَكَ عنَّا فإنَّ أطولَكم جوعًا يومَ القيامةِ أكثرُكم شبعًا في دارِ الدُّنيا 'তোমার ঢেকুরকে আমাদের থেকে প্রতিহত করো। কারণ পার্থিব জীবনে যারা ভুরিভোজ করে, কিয়ামতে তারাই হবে অধিক ক্ষুধার্ত'।[৭৮]

(জ) ছিয়ামের আহকাম জানার মাধ্যমে: আহলুল ইলমের মতে, ছিয়াম ফরয হওয়া সকলের উপর ছিয়ামের আহকাম জানা আবশ্যক। কারণ ছিয়ামের আহকাম, আদব এবং শর্ত না জানাটা এর বিপুল পরিমাণ নেকী থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। অনেক সময় ব্যক্তি ছিয়াম পালন করে, অথচ তার ছিয়াম ভঙ্গের আবশ্যকীয় শারঈ কারণ রয়েছে। আবার কখনও ব্যক্তি ছিয়াম পালন করে, অথচ সে ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারে না- শুধু ছিয়ামের আহকাম না জানার কারণে।

পরিবর্তনের বিশেষ সুযোগ রামাযান মাস:

আল্লাহ তাআলা সৎ বান্দাদের উপর এমন কিছু বরকতময় সময় দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন, যেথায় রয়েছে দ্বিগুণ নেকী, ঈমান বৃদ্ধির বিস্তৃত পরিবেশ এবং আত্মার মর্যাদা সমুন্নতকরণের অফুরন্ত সুযোগ। এর মাঝে অন্যতম রামাযান মাস। এ মাসকে তওবা করা, নিজেকে পাপমুক্ত করা এবং ঈমান নবায়ন করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গণ্য করা হয়।[৭৯] ফলে মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক হলো, আত্মিক বা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এ মাসকে স্বাগত জানানো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ 'ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোমলিন হোক, যার নিকট আমার কথা উল্লেখ করা হলো, অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করল না। ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোমলিন হোক, যে রামাযান মাস পেল, অতঃপর তাকে ক্ষমা করার পূর্বেই তা অতিবাহিত হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোমলিন হোক, যে মাতাপিতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ তা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না'।[৮০]

সুতরাং যারা অবাধ্য আচরণ ও পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তারা যেন এই রামাযান মাসকে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই তওবা ও ইস্তিগফারের পথ বেছে নেয়। নচেৎ উদাসীনতা ও আল্লাহ তাআলার আদেশকে অবজ্ঞা করার দরুণ তাদের চরম লজ্জিত হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ 'অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু আসে, সে বলে, হে আমার রব! আমাকে আবার (দুনিয়ায়) প্রেরণ করুন' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৯৯)*।

রজব মাসে রামাযানের জন্য যেভাবে প্রস্তুতি নিবেন:

রামাযানের প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে সালাফগণ শুধু শা'বান মাসের উপর সীমাবদ্ধ থাকতেন না, বরং রজব মাস থেকেই প্রস্তুতি শুরু করতেন। তাদের কেউ কেউ বলতেন, রজব হলো বৃক্ষরোপণের মাস। শা'বান হলো তাতে পানি দেওয়ার মাস। আর রামাযান হলো ফল আহরণ করার মাস। সুতরাং যদি আপনি রামাযানে ফল খেতে চান, তবে রজব মাসে বৃক্ষরোপণ এবং শা'বান মাসে তাতে পানি দেওয়া আবশ্যক'। আস-সারি আস-সাক্বাতী রহিমাহুল্লাহ অনুরূপ বলেছেন। এজন্য রজব মাসে সৎ আমল সম্পাদনের দৃঢ় প্রস্তুতি নেওয়া এবং শা'বান মাসে তা গুরুত্বের সাথে চলমান রাখা উচিত। তাহলেই ফল আহরণ এবং রামাযানের ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব।[৮১]

শা'বান মাসে রামাযানের জন্য যেভাবে প্রস্তুতি নিবেন:

শা'বান মাসকে কল্যাণ এবং ইবাদতের মৌসুম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই মাসকে আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ দান করেছেন। কারণ শা'বান মাস মহিমান্বিত রামাযান মাসের আগের মাস। এজন্যই রামাযান মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য শা'বান মাস থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। নিম্নে শা'বান মাসে পালনীয় কিছু আমল উল্লেখ করা হলো:

৭৮. ইবনু মাজাহ, হা/২৭২১, হাদীছটি ছহীহ।
৭৯. দুরূসু আশ-শায়খ আব্দুর রহমান আস-সুদাইস, ৭৭/৮।
৮০. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৬৮০।
৮১. আসরার আল-মুহিব্বীন ফী রামাযান, পৃ. ৪৮।

(ক) শা'বান মাসের ছিয়াম: মুমিনদের জন্য বাঞ্ছনীয় হচ্ছে, তারা শা'বান মাসের ছিয়ামের ক্ষেত্রে রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় সম্পূর্ণ শা'বান মাসেই ছিয়াম রাখতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, كَانَ يَصُومُ حَتَّى تَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى تَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে ছিয়াম রাখতেন, আমরা বলতাম, তিনি আর ছিয়াম ছাড়বেন না। আবার তিনি এমনভাবে ছিয়াম ছেড়ে দিতেন, আমরা বলতাম, তিনি আর (এ মাসে) ছিয়াম রাখবেন না। তিনি শা'বান মাসের চেয়ে (রামাযান ব্যতীত) অন্য মাসে এত বেশি ছিয়াম রাখতেন না। যেন তিনি পুরো শা'বান মাসেই ছিয়াম রাখতেন'।[৮২]

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বান্দার অন্তরে শয়তান এভাবে ধোঁকা দেয় যে, শা'বান মাসে ছিয়াম পালন করলে রামাযানের ছিয়ামের ক্ষেত্রে দুর্বলতা চলে আসবে। অথচ সঠিক বিষয়টি হলো, যে ব্যক্তি পাপের ক্ষমা ও নেকীর আশায় শা'বান মাসেও ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে উভয় মাসেই ছিয়াম পালনের তাওফীক্ব দান করবেন। আল্লাহ তাআলা যখন বান্দার জন্য ইবাদত বা ক্ষমার পথ উন্মুক্ত করেন, তখন তার জন্য ইবাদত পালনের সহযোগী বিষয়াদিও সহজ করে দেন। মৌলিক কথা হলো, মুসলিম ব্যক্তি শেষ পরিণতির কথা চিন্তা না করে ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে। কারণ শেষ পরিণতি কেবল রবের হাতেই আর নিশ্চিতরূপেই তা প্রশংসিত হবে, ইনশা-আল্লাহ!

(খ) অবসর সময়কে ইবাদতে রূপান্তরিত করা: শা'বান মাসের ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুসলিমই উদাসীন থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে সতর্কতা আরোপ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে, সে অন্য মানুষের উদাসীনতার প্রতি আগ্রহী হয় না। কারণ তাদের উভয়ের চলার পথ আলাদা। বরং সে রবের প্রদর্শিত পথে ধাবিত হয় এবং ভগ্ন হৃদয়, বিনয়, দু'আ, আনুগত্য ও যিকিরের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্যশীল হওয়ার চেষ্টা করে। অবসর সময়কে ইবাদতে রূপান্তরকরণের কয়েকটি উপকার—

১. আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন: বিশেষত আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত বান্দাদেরকে ভালোবাসেন, যারা এমন সময়ে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে, যখন অন্যরা উদাসীনতায় বিভোর থাকে।

২. বিপদাপদ দূরীভূত হয়: আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ 'আল্লাহ তাআলা কেনই-বা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন- যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং বিশ্বাস স্থাপন কর? আর আল্লাহ তাআলা তো অতিশয় গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী' *(আন-নিসা, ৪/১৪৭)*।

৩. দ্বিগুণ নেকী লাভ: মানুষের উদাসীনতার সময়ে ইবাদত করাটা কঠিন ও অধিকতর জটিল। ফলে এ সময়ের ইবাদতে দ্বিগুণ নেকী পাওয়া যায়।

(গ) ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা: কঠিন অন্তর, আনুগত্যে উদাসীনতা ও আল্লাহর আদেশের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে অগ্রগামী করার মাধ্যমে যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে, তার উপর আবশ্যক হলো নাফসের বিরুদ্ধে ইবাদতের ক্ষেত্রে সংগ্রাম করা। এটা হলো সত্য ও সঠিকতায় অবিচল থাকার পথ। বান্দার মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই বান্দাদের নিকটবর্তী হন, যারা তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে। আর যখন আল্লাহ তাআলা কারো দিকে অগ্রগামী হন, তখন তাকে সৎকর্মে তাওফীক্ব দান করেন, অনিষ্ট থেকে হেফাযত করেন, চলার পথ সঠিক করে দেন এবং সীমাহীন কল্যাণ দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রব থেকে বর্ণনা করে বলেন,

وما تقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بشيءٍ أحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَألَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وما تَرَدَّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعِلُهُ تَرَدُّدِيعن نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وأنا أكْرَهُ مَساءَتَهُ.

'আমার বান্দা যে সমস্ত ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাছিল করে থাকে, তার মধ্যে আমার কাছে অধিক প্রিয় ইবাদত হলো, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয়পাত্র বানিয়ে নিই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোনো কাজ করতে চাইলে তা করতে কোনো দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দেওয়াকে অপছন্দ করি'।[৮৩]

৮২. নাসাঈ, হা/২১৭৮।

৮৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২।

(ঘ) উত্তম আমল সম্পাদন করা যাতে তা আল্লাহর কাছে উত্থাপিত হয়: উত্তম বা শ্রেষ্ঠ আমল সম্পাদনের জন্য শা'বান মাসকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা বান্দার কর্তব্য। কারণ শা'বান মাসে আল্লাহ তাআলার কাছে আমলসমূহ উত্থাপন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাস সম্পর্কে বলেন, ذٰلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ 'এটা রজব ও রামাযান মাসের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস, যাতে মানুষেরা উদাসীন থাকে এবং এ মাসে (শা'বান) বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট আমলসমূহ উত্থাপন করা হয়। আমি পছন্দ করি যে, আমি ছিয়াম পালন করা অবস্থায় আমার আমল উত্থাপিত হোক'।[৮৪]

(ঙ) বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা: রামাযান মাসের প্রস্তুতিস্বরূপ শা'বান মাসে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা উচিত। কারণ রামাযান হলো কুরআনের মাস। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ 'রামাযান হলো এমন মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। যে ব্যক্তি শা'বান মাসে কুরআন তেলাওয়াত চলমান রাখবে, সে সহজেই রামাযান মাসে কুরআন তেলাওয়াতের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে।

(চ) তাহাজ্জুদের ছালাত এবং দীর্ঘ সময় ক্বিয়াম করা: নিয়ম হলো- একজন মুসলিম তাহাজ্জুদ এবং দীর্ঘ ক্বিয়ামে নিজেকে অভ্যস্ত করবে, যেন এমন না হয় যে, রামাযান মাস অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে; অথচ সে দীর্ঘ ক্বিয়ামে অভ্যস্ত হয়নি। কারণ ইবাদতের ক্ষেত্রে ক্বিয়ামুল লায়লের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ 'রব বান্দার অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকেন রাতের শেষ মধ্যভাগে। যদি সক্ষম হও, তবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হও, যারা ঐ সময়ে আল্লাহর যিকির করে'।[৮৫]

সালাফগণ যেভাবে রামাযানের প্রস্তুতি নিতেন:

সালাফগণ রামাযান মাসের আগমনে ব্যাপক খুশি হতেন। কারণ ছিয়াম ইসলামের স্তম্ভসমূহের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর নির্মিত— (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। (২) ছালাত ক্বায়েম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) (সামর্থ্য থাকলে) হজ্জ পালন করা এবং (৫) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা'।[৮৬]

সালাফগণ নিজেদেরকে নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত করতেন। কারণ ছিয়াম হলো জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَن صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন ছিয়াম পালন করে, আল্লাহ তাআলা তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে ৭০ বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে দেন'।[৮৭]

এছাড়াও সালাফগণ নিজেদেরকে দীর্ঘ ক্বিয়ামুল লায়লের প্রশিক্ষণ দিতেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বান্দা যখন নিয়মিত ক্বিয়ামুল লায়ল করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার চেহারায় এমন নূর দান করেন, ফলে সকল মুসলিম তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। তাকে যারা কখনোই দেখেনি, তারাও তাকে চিনে ফেলেন এবং বলেন, অবশ্যই আমি এই ব্যক্তিকে ভালোবাসি।

সালাফগণের ইবাদতের মাঝে কুরআন তেলাওয়াত অন্যতম। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রামাযানের প্রত্যেক দিনে কুরআন খতম করতেন। সুফিয়ান ছাওরী রাহিমাহুল্লাহ অন্যান্য ইবাদত ব্যতিরেকে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি ধাবিত হতেন।

> এভাবে আমরা সালাফদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, তারা রামাযান মাসকে সত্যিকার অর্থেই একটি গনীমত হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং এই মাসকেন্দ্রিক আমলগুলোকে পালন করার মাধ্যমে এই মাসকে অর্থবহ করে তুলতেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের বরকতময় এই মাসকে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস হিসেবে যথাযথ মূল্যায়ন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন! ***-অনুবাদক***

৮৪. নাসাঈ, হা/২৩৫৬, হাদীছটি ছহীহ।
৮৫. ছহীহুল জামে', হা/১১৭৩, হাদীছটি ছহীহ।
৮৬. ছহীহ বুখারী, হা/৮।
৮৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৩।

ছিয়াম সাধনা: শরীর, মন ও আত্মার পূর্ণতা

-সায়্যিদ তানভীর নদবি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত জীবনবিধান। ইসলামে বিভিন্ন ধরনের ইবাদত রয়েছে। কিছু ইবাদত বচন বা কথার সাথে সম্পর্কিত, যেমন- যিকির, দু'আ, ভালো কাজের দিকে আহ্বান, দ্বীনী আলোচনা, শিক্ষা ও শিক্ষাদান ইত্যাদি। কিছু ইবাদতের সম্পর্ক কাজের সঙ্গে, তা শারীরিক হোক, যেমন- ছালাত; অথবা আর্থিক হোক, যেমন- যাকাত ও ছাদাক্বা; অথবা শারীরিক ও আর্থিক উভয়টির সাথে সম্পর্কিত, যেমন- হজ্জ ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। কিছু ইবাদত এমন, যেগুলো শুধু কথা বা কাজের সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং এতে নির্দিষ্ট কিছু কাজ থেকে বিরত থাকার বিধানও রয়েছে, যেমন- ছিয়াম।

অধিকাংশ আলেম ছিয়ামকে শারীরিক ইবাদতের মধ্যে গণ্য করেছেন আর এটাই বিশুদ্ধতার নিকটবর্তী, কারণ কোনো কিছু থেকে বিরত থাকাও তো একটি কাজ ও আমল।

ছিয়ামের বাস্তবতা:

ইবাদতের নিয়্যতে ছুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম। এই ইবাদত ইসলাম পূর্ববর্তী অন্যান্য ধর্মেও গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য সহকারে বিধিবদ্ধ ছিল। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার' *(আল-বাকারা, ২/১৮৩)*।

ছালাত ও যাকাতের মধ্যে সামগ্রিকতা ও প্রাধান্যের দ্বারা এগুলোকে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের ছালাত ও যাকাত থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ছিয়ামকেও অন্যান্য ধর্মের ছিয়ামের তুলনায় বিশেষত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে রামাযান মাসের ছিয়ামকে ফরয করা হয়েছে এবং এই মাসকেই নির্বাচন করা হয়েছে, যে মাসে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিমদেরকে হেদায়াতের বিধান অর্থাৎ কুরআনুল কারীম দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ 'রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সঠিক পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে, সে যেন এই মাসে ছিয়াম রাখে' *(আল-বাকারা, ২/১৮৫)*।

ছিয়ামের উপকারিতা:

ছিয়াম ফরয করার মধ্যে অনেক প্রজ্ঞা ও উপকারিতা নিহিত রয়েছে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যদিও আমাদের সীমিত বুদ্ধি সে সকল রহস্য, প্রজ্ঞা ও উপকারিতা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না; তবে আমাদের বোধগম্য হয় এমন কিছু হিকমত বা প্রজ্ঞা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

এ বিষয়ে আমাদের প্রথমে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যে, মানুষের প্রকৃত সত্য কী? মানুষ কি মাংস, চামড়া, হাড় ও চামড়ার এই বাহ্যিক সমষ্টির নাম? নাকি এর সত্য এই বাহ্যিক কাঠামোর বাইরে ভিন্ন কোনো জিনিস? স্পষ্টতই, শুধু এই বাহ্যিক কাঠামোকে কখনও মানুষ বলা যাবে না। কারণ এই ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে অধিক হীন এবং নিম্নস্তরের কোনো সৃষ্টি থাকবে না। যদিও মানুষ সৃষ্টির সেরা ও বিশ্বজগতের সারাংশ, তাই অবশ্যই মানতে হবে যে, মানুষ এই বাহ্যিক আকৃতি এবং রূপের নাম নয়; বরং এটি অন্য কিছু জিনিসের নাম, যার কারণে সে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান রাখে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, শেষ পর্যন্ত সেই জিনিসটি কী, যার মাধ্যমে মানবতার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়? তাই মানুষের আত্মা সম্পর্কে চিন্তা করলে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষ একটি আধ্যাত্মিক সত্তার নাম, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা চিন্তা এবং বোঝার ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন, যার মাধ্যমে সে শুধু বুঝতে পারে তা কিন্তু নয়; বরং সমগ্র বিশ্বজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই বিশেষ গুণের কারণে আদম ফেরেশতাদের সিজদাপ্রাপ্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআন এই সত্যকে এভাবে ব্যক্ত করেছে, ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ - فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ '(আর স্মরণ করুন,) যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন,

আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে। অতএব, যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার জন্য সিজদাবনত হও' *(আল-হিজর, ১৫/২৮-২৯)*।

যেহেতু নফসের ইচ্ছাগুলো দমন করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায় আর ছিয়ামে পানাহার ও যৌন ইচ্ছার পরাজয় ঘটে, তাই অবশ্যই এতে আধ্যাত্মিকতার শক্তি অর্জিত হয় এবং এই আধ্যাত্মিক সত্তার কারণে মানুষকে মানুষ বলা হয়। তাই ছিয়ামের মাধ্যমে মানবতার গঠন এবং পরিপূর্ণতা ঘটে।

ছিয়াম যেভাবে আত্মাকে শক্তি যোগায়, ঠিক তেমনি এটি শরীর পরিশোধন করে। কারণ বেশিরভাগ রোগ পেটের অসুস্থতার কারণে সৃষ্টি হয়, যেমন বলা হয়, 'পেট রোগের মূল'। নবী ﷺ ও একটি হাদীছে বলেছেন,مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ 'মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না'।[৮৮] তাই যখন পেটের রোগ অসুস্থতার পূর্বাভাস দেয়, তখন এর চিকিৎসা হলো পেটকে খালি রাখা এবং ছিয়ামের মাধ্যমে পেট খালি রাখা হয়। যার মাধ্যমে শরীর পরিশোধিত হয় এবং মানুষ অনেক রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ছিয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো- এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ধৈর্য ও স্থিরতার শক্তি সৃষ্টি হয়, যা মানুষের জন্য একটি মহান গুণ। ছিয়াম পালনকারীর সামনে সুস্বাদু ও পছন্দনীয় খাবার, ঠাণ্ডা ও মিষ্টি পানি রাখা হয়; কিন্তু সে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়েও দেখে না। যদিও বাহ্যিকভাবে এই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই; কিন্তু তার বিবেক তাকে প্রস্তুত করে না যে, সে তার ছিয়াম নষ্ট করে আল্লাহর ক্রোধের যোগ্য হয়ে উঠবে। এক মাসের এই অনুশীলন অবশ্যই মানুষের মধ্যে স্থিরতা ও ধৈর্যের শক্তি সৃষ্টি করবে। মনোবিজ্ঞানীরা তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন যে, ছিয়ামের চেয়ে বেশি ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করার মতো অন্য কোনো জিনিস নেই। এই কারণেই নবী ﷺ বিশেষভাবে যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। কারণ বিয়ে চোখকে নিচু রাখে এবং যৌনাঙ্গকে রক্ষা করে। আর যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ছিয়াম রাখে। কারণ ছিয়াম তার জন্য একটি ঢালস্বরূপ'।[৮৯]

ছিয়াম অনেক ধৈর্যের কাজ। মানুষের মধ্যে তিনটি শক্তি রয়েছে— একটি হলো কামনা-বাসনার শক্তি, দ্বিতীয়টি হলো ক্রোধের শক্তি এবং তৃতীয়টি হলো আধ্যাত্মিক শক্তি। আর ছিয়ামের মাধ্যমে মানুষ কামনা-বাসনার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই সে এর মাধ্যমে অনেক ধৈর্য অর্জন করে।

ইসলাম শুধু নাম ও প্রদর্শনের জীবনব্যবস্থা নয়; বরং এখানে প্রতিটি মুহূর্তে জিহাদ করতে হয়। জিহাদের জন্য ধৈর্য ও স্থিরতা একটি অপরিহার্য জিনিস। তাই যে ব্যক্তি তার নিজের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারে না, সে তার শত্রুর বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করবে? যার নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, সে তার শত্রুকে কীভাবে পরাজিত করবে? যে এক দিনের ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ধৈর্য ধরে না, সে ঘরবাড়ি ছেড়ে কীভাবে ধৈর্যধারণ করবে? তাই বছরে এক মাসের ছিয়ামের নির্দেশ দিয়ে ধৈর্য ও স্থিরতার অনুশীলন করানো হয়, যাতে মানুষ জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

ছিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দেওয়া নেয়ামতগুলোর মূল্য ও মর্যাদার জ্ঞান অর্জিত হয়। কারণ প্রত্যেক বস্তু তার বিপরীত বস্তু দ্বারা পরিচিতি লাভ করে। যতক্ষণ না মানুষ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার তীব্রতা অনুভব করে, ততক্ষণ সে পানাহারের প্রকৃত মূল্য কীভাবে বুঝবে? যখন সে এই নেয়ামতগুলোর মূল্য ও মর্যাদার জ্ঞান অর্জন করবে, তখন মানুষ হক্ব পূরণে অধিক সচেষ্ট হবে। তাই এভাবে ছিয়াম আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া ও তাঁর ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী প্রভাব রাখে।

ছিয়ামের কারণে যখন মানুষ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার তীব্রতা অনুভব করে, তখন তার মধ্যে গরীব এবং মিসকীনদের কষ্টের অনুভূতি জাগ্রত হয়। কারণ যে ব্যক্তি সুখ ও সমৃদ্ধিতে বেড়ে উঠেছে, সে কখনও ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করেনি; তার ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্তদের অবস্থা এবং কষ্ট সম্পর্কে কী জানা থাকবে? কিন্তু ছিয়ামের কারণে যখন সে ক্ষুধার কষ্টের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন তার মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি হবে যে, গরীব ও অসহায়দের সাহায্য ও সহায়তা করে, তাদের এই কষ্ট থেকে তাদের বাঁচাবে।

৮৮. ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৪৯।

৮৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৬।

এই সমস্ত সুবিধার পাশাপাশি ছিয়াম থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় অর্জিত হয়, তা হলো নিজেকে আল্লাহ তাআলার কাছে সমর্পণ করা এবং এই সমর্পণ ও আত্মসমর্পণ প্রতিটি ইবাদতের ফলাফল ও সারাংশ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ‘আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল’ *(আল-বাকারা, ২/২৮৫)*।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ‘বলুন, নিশ্চয় আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব’ *(আল-আনআম, ৬/১৬২)*।

এই সমর্পণ ও সন্তুষ্টি ছিয়ামের মাধ্যমে এভাবে অর্জিত হয় যে, ছিয়াম পালনকারীর সামনে তার পছন্দের জিনিসগুলি উপস্থিত থাকে, যেগুলো ব্যবহার করার ক্ষমতা সে রাখে এবং সেগুলো ব্যবহার করার তার তীব্র ইচ্ছাও থাকে; কিন্তু সে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেগুলো স্পর্শ করে না এবং সেগুলো ব্যবহার থেকে বিরত থাকে। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা ছিয়ামকে বিশেষভাবে তাঁর দিকে সম্বন্ধিত করেছেন।

রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য; তবে ছিয়াম শুধু আমার জন্য এবং আমি এর প্রতিদান দেব। সে আমার জন্য তার খাবার ছেড়ে দেয়, আমার জন্য তার পানীয় ছেড়ে দেয়’।[৯০]

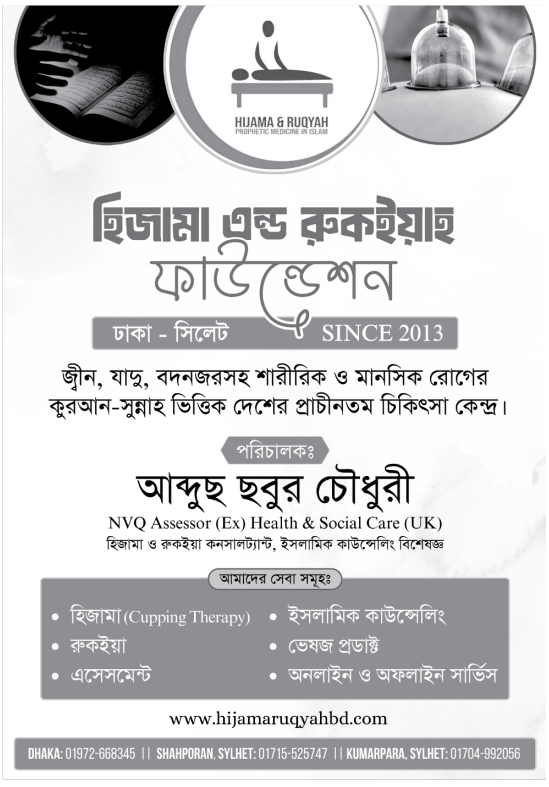
ছিয়ামের বিধানের উদ্দেশ্য মানুষকে কষ্টে ও কঠিন অবস্থায় ফেলা নয়, যেমন আল্লাহ তাআলা ছিয়াম ফরয করার পর এই হিকমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না’ *(আল-বাকারা, ২/১৮৫)*।

ছিয়ামের উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিকতাকে শক্তিশালী করা, ইচ্ছাশক্তিতে দৃঢ়তা সৃষ্টি করা, ধৈর্য ও সন্তুষ্টির অভ্যাস গড়ে তোলা, শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করা এবং আল্লাহ তাআলার নেয়ামতগুলোর মূল্য ও মর্যাদা মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করা।

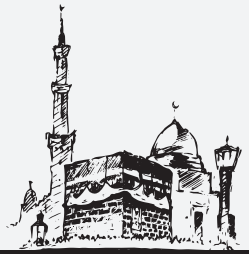
ছিয়াম ও আমাদের আচরণ:

রামাযান মাসের ছিয়াম যে সমস্ত ভালো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ফরয করা হয়েছিল, আমাদের পূর্বসূরীরা ছিয়ামের আদব ও ওয়াজিবগুলো মেনে চলার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যগুলো পুরোপুরি অর্জন করেছেন। তারা দিনে ছিয়াম রাখতেন এবং রাত জেগে আল্লাহর ধ্যান, ছালাত ও তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। তারা রামাযান মাসের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন, তারা তাদের জিহ্বাকে পরনিন্দা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন, তাদের কানকে অনর্থক ও অশালীন কথা শোনা থেকে রক্ষা করতেন এবং তাদের চোখ হারাম জিনিসের দিকে কখনও যেত না। এভাবে তাদের সমস্ত অঙ্গ ছিয়াম থাকত; কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা হলো যে, আমরা এই পবিত্র মাসকেও অন্যান্য মাসের মতো অনর্থক নষ্ট করে দেই। আল্লাহ তাআলা ছিয়ামকে ফরয করেছেন, যাতে এর মাধ্যমে আত্মা ও হৃদয় উপকৃত হয়, কিন্তু আমরা ছিয়ামকে পেট ও পাকস্থলি পূর্ণ করার মাস বানিয়েছি। আল্লাহ তাআলা এটিকে ধৈর্য অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা এটিকে ক্রোধ ও রাগের মাস বানিয়েছি। আল্লাহ তাআলা এটিকে শান্তি ও মর্যাদার মাস বানিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা এটিকে গালাগালি ও ঝগড়া-বিবাদের মাস বানিয়েছি। আল্লাহ তাআলা ছিয়ামকে ফরয করেছেন, যাতে আমাদের অভ্যাসগুলোতে পরিবর্তন আসে; কিন্তু আমরা খাওয়ার সময় পরিবর্তন করার বাইরে আর কিছুই করিনি।

আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং রামাযান মাসকে অর্থবহ মাস হিসেবে পালন করার মাধ্যমে এর প্রকৃত ফায়েদা অর্জন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!



৯০. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪।



হারামাইনের মিম্বার থেকে

তাক্বওয়া ও সুন্দর চরিত্রের নিবিড় সম্পর্ক

[২৮ জুমাদাল আখের, ১৪৪৭ হি. মোতাবেক ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ আহমাদ ইবনু আলী ইবনু আব্দির রহমান আল-হুযায়ফী** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন **ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁর নিকটেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা নিজেদের নফসের খারাপী ও মন্দ কাজের ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়াত করার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মরো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহই তত্ত্বাবধানকারী' *(আন-নিসা, ৪/১)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করল' *(আল-আহযাব, ৩৩/৭০-৭১)*।

অতঃপর, হে ঈমানদার ভ্রাতৃমণ্ডলী! প্রকৃতপক্ষে তাক্বওয়াই আপনাদের প্রতিপালকের কাছে মর্যাদার মানদণ্ড আর পরকালে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মাননীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*। অতএব, আপনারা তাক্বওয়ার পথে অবিচল থাকুন, তার আলোয় নিজেকে আলোকিত করুন। আর জেনে রাখুন! সুন্দর চরিত্র ব্যতীত উত্তম গুণাবলির সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না এবং প্রশংসনীয় গুণাবলির চাঁদও পূর্ণতা পায় না।

অতএব, আপনারা আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের প্রতি লক্ষ করুন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাক্বীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন' *(আলে ইমরান, ৩/১৩৩-১৩৪)*।

এখানে লক্ষ করুন, কীভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টির প্রতি সদাচরণকে মুত্তাক্বীদের গুণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারীদের 'মুহসিন' বলে অভিহিত করেছেন। আর যে ব্যক্তি এমন গুণে গুণান্বিত, সে যেন তাক্বওয়া ও ইহসানের গুণের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর সান্নিধ্য ও সহায়তার সুসংবাদ গ্রহণ করে। যেমনটি মহান আল্লাহ নিজেই জানিয়েছেন এবং এ কথার মাধ্যমে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল' *(আন-নাহল, ১৬/১২৮)*।

অতএব, আপনারা কুরআনের সেই সূক্ষ্ম অর্থটির প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, সেখানে কীভাবে আল্লাহ তাআলা তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্রের মধ্যে এক দৃঢ় ও গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। আর এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণীতে, আবূ যার رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজ করো, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো'।[৯১]

এছাড়াও আবূ হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন কর্মটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, 'আল্লাহভীতি, সদাচরণ ও উত্তম চরিত্র'।[৯২] নিশ্চয় তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্রের মধ্যকার এই দৃঢ় সম্পর্ক ও সুগভীর মর্মার্থ ইসলামের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলাম মানুষের জীবনের সব দিককে অন্তর্ভুক্ত করেছে, আর তার ব্যাপ্তি এতটাই বিস্তৃত যে, তা একজন মুসলিমের সম্পূর্ণ জীবনকে শামিল করে এবং মানুষের বাস্তব জীবনের ভেতরেই জীবন্ত হয়ে থাকে।

ইসলাম হলো আক্বীদা, আহকাম ও আচরণের সমন্বয়ে গঠিত একটি ধর্ম। ইসলাম কেবল বাহ্যিক ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কোনো ধর্ম নয়, বরং তা মানুষের লেনদেন ও পারস্পরিক আচরণে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং বাস্তব আমল ও ব্যবহারিক জীবনে তা প্রতিফলিত হয়। এভাবে ইসলাম অন্তরের পবিত্রতা ও বাহ্যিক আচরণের শুদ্ধতা উভয়কেই একসঙ্গে সমন্বয় করে।

হে মুমিন নর ও নারীগণ! যখন এই মহান দ্বীন মানুষের অন্তরে নৈতিকতার মর্যাদা উঁচু করতে এবং মানুষের বাস্তব জীবনে তা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যাতে মুসলিম তার নফসের পরিশুদ্ধতার মতোই বাহ্যিক আচরণেও উন্নত হয়। তার বিশ্বাস যেমন পরিশুদ্ধ হয়েছে তেমনি তার আচার-ব্যবহারও পরিশুদ্ধ হয়, তখন দ্বীন উত্তম চরিত্রকে ঈমানের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করেছে এবং একে ঈমানের পরিপূর্ণতার অংশ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলিম হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম, তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম'।[৯৩]

সুতরাং সৃষ্টিজগতের মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ ব্যতীত কোনো মুমিনের ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না, যাতে তার নফস ও বাহ্যিক আচরণ উভয়ের সৌন্দর্য একত্রিত হয় এবং তার নফসের পবিত্রতা ও জীবনের আচরণগত চরিত্রের নির্মলতা একসঙ্গে পূর্ণতা পায়।

আর হাদীছের শেষ অংশে রয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ করে'। উক্ত হাদীছে রাসূল ﷺ-এর এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে, তা হলো উত্তম চরিত্র ও উন্নত আচরণের প্রকৃত মানদণ্ড হলো এগুলো মানুষের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং স্বভাবের অংশ হয়ে যাওয়া। যাতে এই মহৎ নৈতিক গুণাবলি এমন সুপ্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, যা ছোট-বড়, ধনী-গরীব, অধীন ও শাসক সবার মধ্যেই সমানভাবে প্রকাশ পায়। তখন আর মানুষ নিজের স্বার্থের টানে নিজের রূপ বদলায় না, সামান্য লাভের আশায় কৃত্রিম আচরণ করে না কিংবা ক্ষতি এড়ানোর জন্য ভান ধরে না; বরং সকল মানুষের সঙ্গেই তার উত্তম চরিত্র আন্তরিকতার সাথে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়।

মানুষ যে ঘরটিতে বাস করে, সেটাই তার উত্তম চরিত্রের প্রকৃত মানদণ্ড ও অবিচল মাপকাঠি। কারণ ঘরই হলো সেই পরীক্ষাক্ষেত্র, যেখানে মানুষ কৃত্রিমতা ও ভান পরিত্যাগ করে তার স্বভাবজাত আচরণ করে থাকে। এ কারণেই নবী ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম'।[৯৪]

নিশ্চয়ই মুমিন যখন উত্তম চরিত্রের মর্যাদা ও সৃষ্টির সাথে সুন্দর আচরণের ফযীলত সম্পর্কে জানতে পারে, দুনিয়া ও আখেরাতে তার মহৎ অবস্থান ও উচ্চ মর্যাদা উপলব্ধি করে এবং শরীআতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর যে প্রতিদান নির্ধারণ করা হয়েছে তা অনুধাবন করে; তখন সে উত্তম চরিত্রকে আল্লাহর প্রতি ইবাদতের দৃষ্টান্ত হিসেবে, সৃষ্টির প্রতি শিষ্টাচারের মাধ্যম হিসেবে এবং আত্মশুদ্ধির উপায় হিসেবে ধারণ করে। এর মাধ্যমে সে নিজেকে সর্বোত্তম স্বভাব ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলিতে অভ্যস্ত করে তোলে এবং স্বভাবতই সম্মানিত নফস ও উচ্চ মনোবল যেসব মন্দ স্বভাব ও হীন বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকে সেসব থেকে নিজের নফসকে নিরাপদ রাখে।

আবূ দারদা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন (নেকী) ওযন করার দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্রের

৯১. তিরমিযী, হা/১৯৮৭; মিশকাত, হা/৫০৮৩।
৯২. তিরমিযী, হা/২০০৪, সনদ হাসান।
৯৩. তিরমিযী, হা/১১৬২, হাসান ছহীহ।
৯৪. তিরমিযী, হা/৩৮৯৫।

চেয়ে কোনো বস্তুই অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও কটুভাষী ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন'।[৯৫] আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার ভালো চরিত্রের মাধ্যমে (দিনের) ছওম পালনকারী ও (রাতের) তাহাজ্জুদগুজারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে'।[৯৬] এক্ষেত্রে আপনাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণীই যথেষ্ট, তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং ক্বিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেইসব লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম'।[৯৭]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী বানাও, কারণ সর্বোত্তম চরিত্রের পথপ্রদর্শনকারী তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। আর আমাদের থেকে মন্দ চরিত্রসমূহ দূরে সরিয়ে দাও, কারণ মন্দ চরিত্র থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তুমি ব্যতীত আর কারো নেই।

أقولُ هذا القولَ الذي سمعتُم، وأستغفرُ اللهَ لي ولكم؛ إنه كان غَفُورًا غفورًا.

দ্বিতীয় খুৎবা

অফুরন্ত অনুগ্রহ ও অঝোর ধারায় অবতীর্ণ নেয়ামতের জন্য যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য জ্ঞাপন করছি। এমন প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যার মাধ্যমে নেয়ামত বৃদ্ধি পায় এবং অবারিত অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। অতঃপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর উপর, যাকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন উত্তম শিষ্টাচার ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী করে। আর তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর ছাহাবীগণ আর যারা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে তাদের সকলের উপর এমন দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, যা ভোর ও সন্ধ্যায়, প্রভাত ও অপরাহ্ণে অবিরাম ধারায় প্রবাহিত হতে থাকবে; যতদিন পাখি কুহু কুহু স্বরে ডাকবে, মেঘমালা বৃষ্টিপাত করবে আর মৃদু বাতাস কোমল ও মনোরমভাবে বইবে।

অতঃপর, হে মুমিন নর ও নারীগণ! নিশ্চয়ই আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম চরিত্র, উন্নত আচরণ ও মহান আদবের এক পরিপূর্ণ মানবিক আদর্শ। আর যখন আমরা কুরআনের সেসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করি, যেগুলো এই সম্মানিত নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছে, তখন আমরা আল্লাহর কিতাবে এমন একটি আয়াতের সন্ধান পাই, যাতে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে যে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে সর্বোচ্চ গুণাবলি, সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম ও পূর্ণতার চূড়ান্ত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'নূন, কলমের শপথ আর লেখকেরা যা লেখে তার শপথ। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। আর নিশ্চয় তোমার জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত' *(আল-ক্বালাম, ৬৮/১-৪)*।

আপনাদের জন্য আদর্শ হিসেবে তাঁর চরিত্রই যথেষ্ট, যাকে মহান আল্লাহ নিজেই অতিশয় মহৎ বলে গণ্য করেছেন। কুরআনুল কারীম অল্প কথায় তাঁর মহান চরিত্রের এমন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছে, যার স্বল্প শব্দের মাঝেই নিহিত রয়েছে গভীর ও মহিমান্বিত অর্থ। এটা তাঁর যথার্থ প্রশংসা এবং এটি তাঁর সেই মহান চরিত্রকে সর্বাধিক সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এর বাস্তব ব্যাখ্যা আমরা পাই আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর জবাবের মধ্যে। যখন সা'দ ইবনু হিশাম আয়েশা ছিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কাছে গমন করে জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'খুলূক্ব' (স্বভাব-চরিত্র) ব্যাপারে কিছু বলুন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, তুমি কি কুরআন পড় না? আমি বললাম, হ্যাঁ পড়ি। এবার তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৈতিকতা ছিল আল-কুরআন।[৯৮] অর্থাৎ কুরআনে যে আদর্শ ও নৈতিকতা বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তার জীবন্ত ও বাস্তব রূপ।

নিশ্চয় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ নৈতিকতা ও মহান শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ ও সর্বোত্তম অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। মহান আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে' *(আল-আহযাব, ৩৩/২১)*। তাঁর সমৃদ্ধ জীবনচরিত ছিল নৈতিকতার গুণাবলিতে সুবাসিত, যার মহান স্বভাবের বর্ষণময় মেঘ থেকে অবিরাম কল্যাণ ঝরে পড়ে তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

আর জেনে রাখুন! জুমআর দিন তাঁর উপর বেশি বেশি দরূদ ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব (উত্তম)। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের সর্বোত্তম দিনগুলোর মধ্যে জুমআর দিনটি উৎকৃষ্ট। কাজেই এ দিনে তোমরা আমার প্রতি বেশি পরিমাণে দরূদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়'।[৯৯]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য যেটা ভালো জানেন, সেটাই আমরা চাই; যেটা খারাপ জানেন, তা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই; আর আমাদের সব ভুলের জন্য ক্ষমা চাই। নিশ্চয়ই আপনি সব গোপন বিষয় জানেন।

---

৯৫. তিরমিযী, হা/২০০২, হাদীছ ছহীহ।
৯৬. আবূ দাঊদ, হা/৪৭৯৮, হাদীছ ছহীহ।
৯৭. তিরমিযী, হা/২০১৮, হাদীছ ছহীহ।
৯৮ . ছহীহ মুসলিম, হা/৭৪৬; মিশকাত, হা/১২৫৭।
৯৯ . আবূ দাঊদ, হা/১৫৩১, হাদীছ ছহীহ।

কুরআনের মর্মবাণী

রবের বাণী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

(পর্ব-৩)

سورة البقرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)

﴿الم﴾

'আলিফ-লাম-মীম' বিচ্ছিন্ন কিছু বর্ণ, যাকে আরবীতে হুরূফে মুক্বাত্তা'আত বলা হয়। বাংলায় যেমন আমরা বলি ক, খ, গ। তারপর কোনো কবিতা লেখা শুরু করি। যেমন কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ক, খ, গ এই বর্ণগুলোর মাধ্যমেই রচিত হয়েছে, তেমনি কুরআন মাজীদও আলিফ, লাম, মীম এই বর্ণগুলো দিয়েই তৈরি হয়েছে। এই বর্ণগুলো আরবদের নিকট পরিচিত হলেও তারা কুরআনের মতো একটি সূরা বা আয়াত তৈরি করতে ব্যর্থ, যা কুরআনের ভাষাগত মু'জিযার একটি প্রমাণ বহন করে।

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾

'আর মহান এই কিতাব কুরআন কারীম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে মর্মে এই কিতাবে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই'। নিশ্চিতভাবে এটি মহান আল্লাহর বাণী, যা জিবরীল আলাইহিস সালাম -এর মাধ্যমে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

তাক্বওয়া শব্দের অর্থ পরহেয করা। মানুষ যেমন ডায়েট করা অবস্থায় সকল খাবার খায় না তথা মেপে ও বাছাই করে খায় এবং চিনিজাতীয়, ভাজাপোড়া ও অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট খাবার এড়িয়ে চলে, ভিটামিন ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার বেশি খায়; অনুরূপ বাস্তব জীবনের অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে যারা পরকালকে সামনে রেখে অন্তরের নূর ও পবিত্রতার জন্য ক্ষতিকর কাজগুলো এড়িয়ে চলতে চায়, তারাই মুত্তাক্বী। অন্ধকার রাস্তায় জঙ্গলের মধ্যে চললে যেমন সাপ-বিচ্ছু, জোঁক, পোকা-মাকড়, কাঁটা ইত্যাদি দেখে দেখে ধাপ ফেলতে হয়; তেমনি দুনিয়াতে চলার ক্ষেত্রে যারা এমনিভাবে ভ্রান্তি থেকে বেঁচে সঠিক রাস্তায় চলতে চায়, তাদের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনকারী হচ্ছে এই কিতাব।

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾

গায়েব বা অদৃশ্য দ্বারা সকল ধরনের গায়েব উদ্দেশ্য। ফেরেশতা, শয়তান, রূহ, নাফস, জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব, ক্বিয়ামত, জিনদের জগৎ, আসমানের জগৎ সবই গায়েবের অংশ। গায়েবের কার্যকরণের সূত্রের সাথে দুনিয়ার কার্যকরণের সূত্রের মিল নেই। দুনিয়ায় এক টাকা দান করলে কমে যায়, কিন্তু গায়েবে সেটা বেড়ে যায়। মুসলিমদের গোলামী থেকে মুক্তির প্রথম শর্তই হচ্ছে গায়েবে ইয়াক্বীন তৈরি করা। এজন্য মহান আল্লাহ নবীদেরকে বিভিন্ন গায়েব দেখাতেন, যেমনটা মি'রাজের সফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখিয়েছেন। গায়েবে ইয়াক্বীন তৈরি হলেই আল্লাহর উপর ভরসা মযবূত হয়। ফেরাউনের মতো শক্তিশালী শাসকের বিরুদ্ধে দুর্বল ও অসহায় বানূ ইসরাঈলকে মুক্ত করার জন্য মূসা আলাইহিস সালাম -এর অন্তরে গায়েবে ইয়াক্বীন তৈরি করার লক্ষ্যেই তাকে মহান আল্লাহ লাঠি থেকে সাপে পরিণত করার মু'জিযা দেখিয়েছেন, যা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর শক্তির সামনে ফেরাউনের শক্তি শূন্য।

আর মুত্তাক্বী বা পরহেযগার ব্যক্তির কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তারা গায়েব বা অদৃশ্যের উপর ইয়াক্বীন রাখে।

﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾

মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কখনোই বিজয় সম্ভব নয়। আর মহান আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো ছালাত। দুনিয়ার জগৎ থেকে গায়েবের জগতে যোগাযোগের মাধ্যম ছালাত। মানুষের মোবাইলে যেমন পাসওয়ার্ড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেস ভেরিফিকেশন থাকে— এগুলো দিয়ে মোবাইলের লক ওপেন করা হয়; ছালাত তেমনি মহান আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার বন্ধ দরজাকে খুলে দেয়। হাজার মাইল দূর থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছাত্র যেমন শিক্ষকের সাথে লাইভ ক্লাস করে; ছালাত হলো তার চেয়েও হাজার গুণ উন্নত প্রযুক্তি, যা দিয়ে বান্দা সরাসরি মহান আল্লাহর সাথে লাইভ কানেক্টেড হয়। যতক্ষণ বান্দার অন্তর মহান আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ মহান আল্লাহ বান্দার মুখোমুখি থাকেন। আর তাই ঈমান বিল গায়েবে ইয়াক্বীন অর্জনের পর মুত্তাক্বীরা নিয়মিত ছালাত প্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত হয়ে থাকে। আর প্রতিষ্ঠা অর্থ অন্যকে বাধ্য করা নয়, বরং নিজেই পরিপূর্ণ হুকুম-আহকাম ও খুশূ-খুযূর সাথে ছালাত আদায় করা।

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

গোলামী থেকে মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি খুব জরুরী। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দান-ছাদাক্বার কোনো বিকল্প নেই তথা জান্নাত বিক্রি হয় টাকার বিনিময়ে। কুরআনে সবসময় ছালাতের সাথে যাকাত তথা অর্থনৈতিক ইবাদতকে যুক্ত করা হয়েছে। মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে এখানেও মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আর তাদেরকে আমি যে রিযিক্ব দিয়েছি, তা থেকে দান করে'। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের টাকা দান করতে বলেননি, বরং তাঁরই দেওয়া টাকা দান করতে বলেছেন তথা মহান আল্লাহ আমাদের ধনসম্পদের উপর আমাদের মালিকানাকে অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, এগুলো সব তিনিই দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া টাকা তাঁর রাস্তায় ব্যয় করার মাধ্যমে তিনি আমাদের জান্নাত দিবেন। আর আল্লাহর সাথে এই ক্রয়-বিক্রয় একটি শতভাগ লাভজনক ব্যবসা। তাই প্রত্যেক মুত্তাক্বী মুমিনের উচিত হলো হালাল উপায়ে প্রচুর টাকা-পয়সা ইনকামের চেষ্টা করা এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

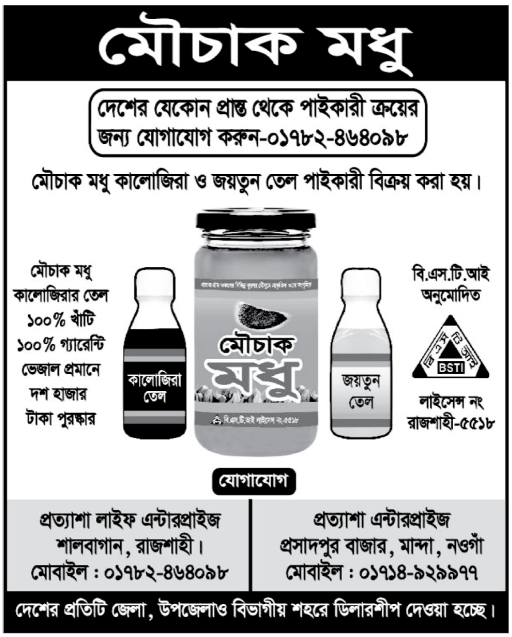
নতুন বছরের নতুনের বাকি অংশ

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মক্ষমতা:

ইসলামে দেহ ও মনের যত্ন নেওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন, فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا 'নিশ্চয়ই তোমার দেহের ওপর তোমার অধিকার রয়েছে'।[১০০] নতুন বছর আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়ন আমাদের জন্য অপরিহার্য। সঠিক খাদ্যাভ্যাস, মানসিক প্রশান্তি এবং জ্ঞানার্জন—এসব আমাদের জীবনের মান বৃদ্ধি করে। শিক্ষিত ও সুস্থ জীবন ইসলামে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনের এক অংশ।

সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ:

নতুন বছর মানে নতুন লক্ষ্য, নতুন দায়িত্ব, নতুন প্রার্থনা এবং নতুন উদ্যোগ। প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করলে এটি কেবল একটি বছর নয়; বরং আধ্যাত্মিক জীবনের নতুন অধ্যায় হয়ে উঠবে। ২০২৬ হোক আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক নবজন্মের বছর। এই নতুন সূচনার সঙ্গে আমরা আগের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে, আত্মসমীক্ষা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টায় এগিয়ে যেতে পারি।



১০০. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৭৫।

ফাযায়েলে আমল

-মাহবূবুর রহমান মাদানী

১. কুরআন পাঠকারীর শ্রেষ্ঠত্ব

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের কোনো একটি অক্ষর পাঠ করবে, তার জন্য এর বিনিময়ে ছওয়াব ধার্য হবে। আর ছওয়াব হচ্ছে আমলের ১০ গুণ। আমি বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর; বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর’।[১০১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রাতে ১০০টি আয়াত পড়বে, তার নাম গাফেল বা অমনোযোগীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে না অথবা তাকে অনুগত বা ইবাদতকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে’।[১০২]

২. কুরআন পাঠকারীর পরকালে মর্যাদা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ - لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾

‘যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসায়ের, যার কোনো লোকসান নেই। কারণ তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিফল পূর্ণমাত্রায় দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দিবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, বড়ই মর্যাদাদানকারী’ *(ফাত্বির, ৩৫/২৯-৩০)*। অর্থাৎ ঈমান আনার পর উক্ত সৎ আমলসমূহ করা বিরাট লাভজনক ব্যবসা।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘(ক্বিয়ামতের দিন) কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পাঠ করতে থাকো এবং ওপরে উঠতে থাকো! অক্ষর অক্ষর ও শব্দ শব্দ স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাকো, যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পড়তে! কেননা তোমার স্থান শেষ আয়াতের নিকটে, যা তুমি পাঠ করবে’।[১০৩]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَسْتَعْتِعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং কুরআনের বিশেষজ্ঞ হয়, সে (ক্বিয়ামতের দিন) অনুগত সম্ভ্রান্ত মালায়েকা বা ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে এবং তা পড়তে পড়তে আটকে যায় আর তা পড়া তার জন্য কঠিন হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব’।[১০৪]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.

আবূ উমামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমরা কুরআন পড়ো, কারণ ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তার ধারক-বাহকদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে’।[১০৫]

শিক্ষা: প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, চাই সে নারী হোক অথবা পুরুষ, ছোট হোক অথবা বড় কুরআন মাজীদ শিক্ষা করা এবং নিয়মিত দৈনন্দিন তেলাওয়াত করা। তাহলে সে উভয় জগতে লাভবান হবে, অন্যথা সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১০১. তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত, হা/২১৩৭, হাদীছ ছহীহ।
১০২. সিলসিলা ছহীহা, হা/৬৪৩, হাদীছ ছহীহ।
১০৩. আহমাদ, হা/৬৭৯৮; আবূ দাঊদ, হা/১৪৬৪, হাসান ছহীহ।
১০৪. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৯৮।
১০৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৪।

সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

ওযূর সুন্নাতসমূহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ওযূর সুন্নাতগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো—

১. মিসওয়াক করা: ওযূর পূর্বে বা কুলি করার পূর্বে মিসওয়াক করা। যেসব জায়গায় মিসওয়াক করা সুন্নাত, এটি তার দ্বিতীয় স্থান। যে ব্যক্তি ওযূ করতে চায়, তার জন্য ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত। যেমন- আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক ওযূর সাথে তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[১০৬]

২. 'বিসমিল্লাহ' বলা: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তির ওযূ হয় না, যে শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে না'।[১০৭] ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। এটা অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত।

৩. দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা: উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি ওযূর পানি চাইলেন। এরপর তিনি ওযূ করতে আরম্ভ করলেন, অতঃপর তিনি তিনবার তার হাতের কব্জি ধৌত করলেন...। অতঃপর তিনি বললেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার এই ওযূর মতোই ওযূ করতে দেখেছি।[১০৮]

৪. দুই পা ও দুই হাত ধৌত করার সময় ডান দিক হতে শুরু করা: আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা পরিধান করা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক হতে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন।[১০৯]

৫. কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া: নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূর পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, অতঃপর তিনি কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন।[১১০]

বি.দ্র. মুখমণ্ডল ধৌত করার পরও কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া বৈধ।

৬. ছিয়ামরত অবস্থা ছাড়া ভালোভাবে কুলি করা এবং যথাযথভাবে নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করা: লাক্বীত্ব ইবনু সাবরাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ...আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ওযূ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, 'পরিপূর্ণরূপে ওযূ করবে, আঙুলসমূহ ভালোভাবে খিলাল করবে এবং নাকে উত্তমরূপে পানি পৌঁছাবে; তবে ছিয়ামরত অবস্থায় নয়'।[১১১] 'পরিপূর্ণরূপে ওযূ করবে' এই বাক্যের মাঝেই 'ভালোভাবে কুলি করার' প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

৭. এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে দেওয়া: আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ...অতঃপর তিনি পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি বের করে এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরূপ তিনবার করলেন...।[১১২]

৮. মাথা মাসাহ করার সুন্নাতী পদ্ধতি: দুই হাত দিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে পেছন ভাগ পর্যন্ত মাসাহ করা। এরপর হাতদ্বয়কে পেছন থেকে টেনে যে স্থান থেকে শুরু করেছে সে স্থানে ফিরিয়ে আনা। পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য এই পদ্ধতিতে মাসাহ করা সুন্নাত। তবে নারীদের ঘাড়ের ঝুলন্ত চুল মাসাহ করতে হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাসাহ করার জন্য) নিজের দুই হাতকে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। আবার পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন। অর্থাৎ মাথার সামনের অংশ হতে 'মাসাহ' শুরু করে দুই হাত পিছন পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর আবার পিছন থেকে শুরু করে হাত সেখানে নিয়ে এলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন।[১১৩]

৯. ওযূর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করা: প্রথমবার ধৌত করা ওয়াজিব, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধৌত করা মুস্তাহাব। তিনবারের বেশি ধৌত করা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূতে অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করেছেন।[১১৪] আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা

১০৬. মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৯২৮।
১০৭. মুসনাদে আহমাদ, হা/১১৩৭১।
১০৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৬৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬।
১০৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৫।
১১০. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬।
১১১. আবূ দাঊদ, হা/১৪২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৮৪৬।
১১২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৫।
১১৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৫।
১১৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৭।

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ওযূতে অঙ্গগুলো দুইবার করে ধৌত করেছেন।[১১৫] উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ওযূতে অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করেছেন।[১১৬]

সর্বোত্তম হলো আমলের মধ্যে ভিন্নতা নিয়ে আসা। অর্থাৎ ওযূতে অঙ্গগুলো কখনো একবার করে, কখনো দুইবার করে, কখনো তিনবার করে ধৌত করবে। আবার কখনো সংখ্যায় ভিন্নতা নিয়ে আসবে। যেমন- মুখমণ্ডল তিনবার, হাতদ্বয় দুইবার, দুই পা একবার করে ধৌত করবে। যেমনটি ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে।[১১৭] তবে নবী ﷺ অধিকাংশ সময় ওযূতে অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করতেন।

১০. ওযূর পরে বর্ণিত দু'আ পাঠ করা: উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযূ করবে, এরপর বলবে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল'। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে। এসব দরজার যেটি দিয়ে খুশি সেই দরজা দিয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[১১৮] আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে আরেকটি হাদীছ মারফূ'সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ওযূ শেষে এই দু'আ পড়বে,

سُبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকটেই ফিরে যাব'। তার ছওয়াব কাগজে লেখার পর আল্লাহ তাআলা তার উপর সিলমোহর করে দিবেন, অতঃপর সেটিকে আরশের নিচে রেখে দেওয়া হবে, যা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অক্ষত থাকবে।[১১৯]

১১৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৮।
১১৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৯।
১১৭. যাদুল মাআদ, ১/১৯২।
১১৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৪।
১১৯. মুসতাদরাকে হাকেম, ১/৭৫২। ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটির সনদকে ছহীহ বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এটা মারফূ' নয়; বরং মাওকূফ। আর এটা হাদীছ ছহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা করে না। কেননা তা মারফূ'র হুকুমে।

রামাযানের আগমনের বাকি অংশ

দুঃস্থদের কথা মনে রাখা এসব কাজ শুধু রামাযানের বরকত বাড়ায় না, বরং পরিবারের হৃদয়গুলোকে এক সুতোয় গেঁথে দেয়। রামাযানকে পারিবারিক আনন্দের মাস বানানোই উচিত, অপচয় ও চোখ ফেরানো আমোদের মাস নয়।

দান-ছাদাক্বা রামাযানের আরেক প্রাণ। মানুষের হৃদয়কে নরম করার জন্য দানের চেয়ে কার্যকর কিছু নেই। যখন একজন মুমিন তার সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তখন তার অন্তরে অদ্ভুত এক প্রশান্তি জন্ম নেয়। গরীব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, আত্মীয়দের সহযোগিতা করা, গোপনে দান করা এসব কাজ শুধু দুনিয়ার বোঝা হালকা করে না, বরং আখেরাতে নূর হয়ে জ্বলে ওঠে। রামাযান হলো দানের মাধ্যমে নিজেকে মেহরবান বানানোর প্রশিক্ষণের সময়।

সবশেষে, রামাযানের মূল উদ্দেশ্য হলো তাক্বওয়া। এটি অর্জন করতে হলে গোনাহের দরজা বন্ধ করতে হয়। চোখকে সংযত করা, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা, কানের হেফাযত করা, হাতে অপকার না করা, পায়ে হারাম পথে না হাঁটা—এসবই ছিয়ামের প্রকৃত সৌন্দর্য। ছিয়াম শুধু ক্ষুধা–তৃষ্ণা সহ্য করার নাম নয়; বরং নিজের নফসকে দাসত্বের শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনার নাম। রামাযান মানুষের ভিতরকার পশুটিকে সংযত করে মানুষের মধ্যে থাকা ফেরেশতাসুলভ গুণগুলোকে জাগিয়ে তোলে।

শেষ দশকের বিশেষ গুরুত্ব তো আলাদা করে বলতেই হয়। লায়লাতুল ক্বদরের রাত, যে রাত হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ—তার সন্ধানেই মুমিনরা এগিয়ে যায়। এই দশকে মনোযোগ বাড়াতে হয়, গভীর রাতে আল্লাহর দরবারে কান্না বাড়াতে হয়, ই'তিকাফের মাধ্যমে একান্তে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় করতে হয়। এই ১০ দিনের মেহনতই রামাযানের আসল রূহ গ্রহণ করার শ্রেষ্ঠ উপায়।

শেষত, রামাযানের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেই উচ্চারিত হোক এক নীরব দু'আ: হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে পবিত্র করুন, আমাদের নিয়্যতকে সুস্থ করুন, আমাদের রামাযানকে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বরকতময় রামাযানে পরিণত করুন। আমাদের আমলগুলো কবুল করুন, আমাদের আত্মাকে বদলে দিন, আমাদের অশ্রুকে কবুল করুন, আমাদের গোনাহগুলো ক্ষমা করুন।

এই রামাযান হোক আমাদের জীবনের মোড় ঘোরানো রামাযান- আমীন!

চিন্তাধারা

এআই ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নতুন বছর: ২০২৬ ও আমাদের করণীয়

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

আধুনিক বিশ্বে এখন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন, যিনি চ্যাটজিপিটি কিংবা জেমিনির নাম শোনেননি! অথচ দুই-তিন বছর আগেও এই নামগুলো আমাদের কারও অভিধানে ছিল না। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পুরো পৃথিবীকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে, অল্প সময়েই এগুলো আমাদের দৈনন্দিন আলাপের অংশ হয়ে গেছে।

২০২৫ শেষ হয়ে ২০২৬ শুরু হচ্ছে। আজকের যুগে নতুন বছরে যেকোনো ভালো পরিকল্পনার জন্য এআই এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা অপরিহার্য। আমাদের জেন-জি প্রজন্ম এতটাই সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েছে যে, অনেকেই 'ডিজিটাল জোম্বি'তে পরিণত হয়েছে—নিজস্ব হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সদাসর্বদা সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; নিজেদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

অন্যদিকে আমাদের দৈনন্দিন অসংখ্য কাজ এখন এআই দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে— ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের রিপ্লাই, ছবি ও ভিডিও এডিট, এমনকি সফটওয়্যার-ওয়েবসাইটের কোডিং, গবেষণা-রাইটআপ—সবকিছুতেই মানুষ এআই-এর সাহায্য নিচ্ছে। ফলত সামনে এমন এক পৃথিবী আসছে, যেখানে অযোগ্য, কম দক্ষ মানুষদের জন্য কোনো বাস্তব কর্মক্ষেত্র থাকবে না; শুধু তারাই টিকে থাকবে, যারা হাই-স্কিলড, গভীর কাজে অভ্যস্ত এবং অবিরাম শেখার মানসিকতা রাখে।

অনেকে এআই-কে শুধু 'ফেতনা' বা 'শত্রু' ভেবে দূরে সরিয়ে দিতে চান। কিন্তু ইতিহাস বলছে— রেডিও যখন এসেছে, টিভি যখন এসেছে, পরে মোবাইল, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, ডিশ—প্রতিটি নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ভয় পেয়েছি, 'ফেতনা' বলেছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলোই আমাদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। আজ ছাত্র, ব্যবসায়ী, আলেম-মুফতী-মাওলানা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার—প্রায় সবাই মোবাইল, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছেন।

ঠিক তেমনি, আমরা হাজার চাইলেও এআই-এর উত্থান থামাতে পারব না! বরং প্রতিদিনই আমাদের জীবন এআই-এর মধ্যে আরও গভীরে ঢুকে যাবে। তাই একে দূরে ঠেলে দেওয়া হবে চরম অবাস্তবতা; বরং আমাদের শিখতে হবে—কীভাবে এআই-এর যুগে আমরা সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাব, কীভাবে হাই-স্কিল শিখে ডিপ ওয়ার্ক করে প্রতিযোগিতার এ পৃথিবীতে টিকে থাকব।

সেক্ষেত্রে নতুন বছরে আমরা সবাই মিলে কিছু নীতিমালা অনুসরণ করার চেষ্টা করতে পারি—

(১) জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট করা: লক্ষ্যবিহীন মানুষের জন্য সময় নষ্ট করা সবচেয়ে সহজ কাজ। নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'আমি কেন বেঁচে আছি? আমার জীবনের মিশন কী? আল্লাহর কাছে কী নিয়ে যেতে চাই?' যার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নেই, তার প্রতিটি দিন হয়ে যায় 'এলোপাতাড়ি কাটানো'। এআই-এর যুগে টিকে থাকার প্রথম শর্তই হলো—নিজের জীবনের স্পষ্ট লক্ষ্য ঠিক করা।

(২) ভবিষ্যতের রোডম্যাপ আঁকা: আগামী ৩০ বছরে আমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাই—এই চিত্রটি আগে মনের ক্যানভাসে আঁকতে হবে, তারপর খাতায় লিখতে হবে। মুসলিম হিসেবে নিজেকে কোথায় দেখতে চাই। বাবা হিসেবে, সন্তান হিসেবে, স্বামী হিসেবে নিজেকে কোথায় দেখতে চাই। পেশাগত জীবনে কী ধরনের স্কিল-এর অধিকারী হতে চাই। পরিবার, দাওয়াহ, সমাজ—এদের জন্য কী রেখে যেতে চাই। এই সবকিছুর একটা লং-টার্ম রোডম্যাপ বানাতে হবে।

(৩) মাস্টারপ্ল্যানকে ছোট ছোট ধাপে ভেঙে ফেলা: ৩০ বছরের মাস্টারপ্ল্যানকে চোখের সামনে আনতে হলে আগে ভাবুন, আগামী ১০ বছরে কী হতে হবে। তারপর সেই ১০ বছরের কাজকে ভাগ করুন ৫ বছরে। তারপর ৫ বছরের কাজকে ভাগ করুন আগামী এক বছরে। এভাবে বড় স্বপ্নকে ধীরে ধীরে বাস্তবসম্মত, করণীয় ধাপে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

(৪) এক বছরের প্ল্যান স্পষ্ট হলে—টাইম ম্যানেজমেন্ট ও ডিপ ওয়ার্কে মনোযোগ দেওয়া: যখন আপনার সামনে পুরো বছরের কাজ পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন ফোকাস হওয়া উচিত দুই জিনিসে: টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং ডিপ ওয়ার্ক (গভীর মনোযোগের কাজ)।

এআই ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে যারা দিনভর শুধু নোটিফিকেশন, চ্যাট, স্ক্রল নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তারা পিছিয়ে

পড়বে; আর যারা একাগ্রতা নিয়ে গভীর চিন্তা ও কঠিন কাজ করবে, তারাই নেতৃত্ব দেবে।

(৫) সময় ব্যবস্থাপনায় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শক্তি: টাইম ম্যানেজমেন্ট শেখার ক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতই সর্বোত্তম ফ্রেমওয়ার্ক। বিশেষ করে ফজরের ছালাতের জন্য ঘুম থেকে উঠা এবং ফজরের পরের সময়কে জ্ঞান, লেখা, পরিকল্পনা ও ডিপ ওয়ার্কের জন্য ব্যবহার করা—এগুলো আমাদের দিনকে বদলে দিতে পারে। যে মানুষ ফজরের পরে সময়কে 'জীবন্ত' বানাতে পারে, সে তার পুরো দিনের কাজকে এক ধাপ উপরে তুলে নিতে পারে।

(৬) ডিভাইস ডিটক্স ও ডিপ ওয়ার্কের সময় নির্ধারণ: আমাদের প্রতিদিন একটি বাধ্যতামূলক সময় রাখতে হবে, যেখানে: (১) মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাব—সব ডিভাইস থেকে দূরে থাকব। (২) কেবল গভীর মনোযোগের কাজ করব—পড়াশোনা, বড় কোনো সমস্যা সমাধান, পরিকল্পনা, গবেষণা, ছালাত, দু'আ-তাদাব্বুর ইত্যাদি।

ডিপ ওয়ার্কের জন্য দৈনিক যত বেশি সময় বের করতে পারব, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে আমরা তত বেশি মূল্যবান হয়ে উঠব। এর জন্য ফজরের পরবর্তী সময় দুনিয়া-আখেরাত—দুই দিক থেকেই সেরা সময়।

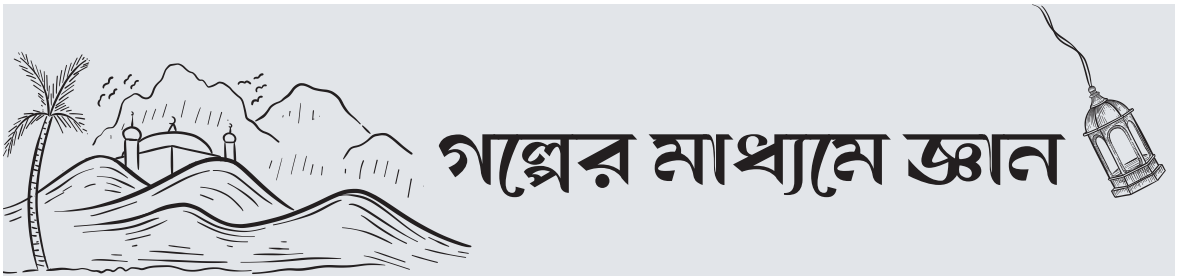
(৭) আধুনিক যুগের 'অক্ষরজ্ঞান' কম্পিউটার ও এআই-এর অক্ষরজ্ঞান: আজকের পৃথিবীতে শুধুই পড়তে-লিখতে পারা অক্ষরজ্ঞান নয়; কম্পিউটার ও এআই-এর বেসিক বুঝাও এক ধরনের অক্ষরজ্ঞান। তাই— এআই—কে ভয় না পেয়ে, এটাকে ভালোভাবে শেখা এবং সঠিক কাজে প্রয়োগ করা জরুরী। অন্যথা আমরা যুগের দৃষ্টিতে অশিক্ষিত হিসেবেই গণ্য হবো—চাই আমরা ডিগ্রি যতই নিই না কেন।

(৮) প্রাইভেসিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া: আজকের বিশ্বে আমাদের ডেটাই হলো বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্য। সকল প্ল্যাটফর্ম আমাদের তথ্য-আচরণ বিশ্লেষণ করে ইনকাম করে। ফলে এমন অবস্থা হয়েছে যে, 'মানুষের নিজের চেয়ে তার মোবাইল, তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, চ্যাটজিপিটি তাকে বেশি চিনে'। এটা মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। তাই— (১) প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া ব্যক্তিগত কোনো কিছুই সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার না করা। (২) বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের ছবি-ভিডিও একদম না দেওয়া, কেননা বদনজর সত্য। (৩) চ্যাটজিপিটি বা অন্য এআই টুল দিয়ে কাজ করতে গিয়ে নিজেদের অতি সেন্সিটিভ পার্সোনাল ডেটা, সিকিউরিটি-সংক্রান্ত তথ্য কখনো শেয়ার না করা।

(৯) শিশু-কিশোরদের জন্য ডিভাইসের ব্যাপারে কঠোর নীতি: ছোট বাচ্চাদের কোনো অজুহাতেই ব্যক্তিগত ডিভাইস দেওয়া ঠিক না। যতটা সম্ভব ১৮ বছরের আগে শিশু—কিশোরদের জন্য ব্যক্তিগত স্মার্টফোন, ট্যাব, ব্যক্তিগত আনলিমিটেড ইন্টারনেট—এসবকে হারাম-পর্যায়ের সতর্কতা নিয়ে দেখা দরকার। অন্যথা আমরা মানুষ নয়, 'জোম্বি প্রজন্ম' তৈরি করব—যারা চিন্তা করবে অ্যালগরিদম দিয়ে, সিদ্ধান্ত নেবে ট্রেন্ড দিয়ে আর জীবন কাটাবে স্ক্রল-ওয়াচ-স্ক্রলের ঘোরে এক দাসের মতো।

(১০) নতুন বছর মানে খুশি নয়, বরং আত্মসমালোচনার সময়: নতুন বছর মানেই সবসময় পার্টি— এটা একটি সেক্যুলার বস্তুবাদী ধারণা। বাস্তবতা হলো নতুন একটি বছর শুরু মানে আমাদের জীবন থেকে একটি বছরের বিদায়; আমরা মৃত্যুর আরও এক বছর কাছে চলে এলাম। তাই থার্টি ফার্স্ট নাইটের নামে সব ধরনের হারাম, বেহায়াপনা ও গাফেলতি থেকে দূরে থাকা জরুরী। **বরং বুদ্ধিমানের কাজ হলো:** ১. গত এক বছরের কাজের হিসাব করা, ২. নিজের গুনাহ, ভুল, অবহেলা নিয়ে আত্মসমালোচনা করা এবং ৩. আগামী এক বছরের জন্য স্পষ্ট পরিকল্পনা ও দুনিয়াবী ও দ্বীনী লক্ষ্যের রোডম্যাপ তৈরি করা।

শেষ কথা, এআই ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগেও মৃত্যু ও আখেরাতের সত্য বদলায় না। আজকের আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জন্য এত বেশি বিনোদনের রাস্তা খুলে দিয়েছে যে, আমরা মৃত্যুর কথা স্মরণ করার সুযোগই পাই না। শয়তান এ সব চাকচিক্য ও বিনোদনের মাধ্যমে আমাদের সেই নিশ্চিত বাস্তবতা—মৃত্যু ও আখেরাত—থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সত্য হচ্ছে— মৃত্যু আমাদের একমাত্র নিশ্চিত গন্তব্য। তাই নতুন বছরে শুধু দুনিয়ার রোডম্যাপ নয়, **আখেরাতের রোডম্যাপও বানাতে হবে:** আমি কীভাবে আল্লাহকে রাযী করব, কীভাবে গুনাহ থেকে তওবা করব, কীভাবে জান্নাতের পথে আমার জীবনকে সাজাব ইত্যাদি। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি— 'হে আল্লাহ! এআই ও সোশ্যাল মিডিয়ার এই নতুন যুগে আমাদের ঈমান, বিবেক ও নিয়ন্ত্রণশক্তিকে মযবূত করে দাও। আমাদের সময়, প্রতিভা ও প্রযুক্তিকে তোমার আনুগত্যের পথে লাগানোর তাওফীক্ব দাও। আমাদের দুনিয়ার রোডম্যাপকে আখেরাতের রোডম্যাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দাও। আমাদের, আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের প্রজন্মকে হেদায়াত ও নিরাপত্তা দান করো- আমীন!



আমিও ছিয়াম রাখব!

-আব্দুল হাসিব বিন আব্দুর রহমান

রামাযান মাস মানেই বরকতময় মাস। পুরো রামাযান মাসকে সাজানো হয়েছে হরেক রকম কাজে। সাহারী থেকে ইফতার, তারপর ক্বিয়ামুল লায়ল সবকিছু বারাকার চাদরে মুড়ানো আছে। রামাযানের আগমনের বার্তা কর্ণকুহরে আসা মাত্রই মনের অলিন্দে ভেসে উঠে হাজারো কাজের প্রতিচ্ছবি। উঁকিঝুঁকি খেলতে থাকে রামাযান মাসের করণীয়গুলো। তৃপ্তির ঢেকুর উঠে ইফতারের বন্দোবস্ত কল্পনার জগতে স্থান পেলে। সাহারীতে ঘুম থেকে জাগার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় রাজ্য জয়ের আনন্দ। ছিয়াম রাখার জন্য আমরা সাহারী করি। সাহারী করতে উৎসাহ দিয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন, تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً ‘তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে’।[১২০]

নিত্যদিনের ন্যায় আজও সাহারীর খাবার প্রস্তুত করা হয়েছে। ঘুমের তীব্রতা যেন চোখ সহ্য করতেই পারছে না। রাজ্যের সব ঘুম যেন আজ তার চোখে। তারপরও একরাশ ঘুম ও আলস্যকে সাথে করে খেয়েই যাচ্ছে ফাহমিদার আদরের ছোট ভাই ফাহিম। এর আগেও আরও কয়েকটি ছিয়াম বিগত হয়ে গেছে। আজ পঞ্চম ছিয়াম। পরিবারের সকলে জাগলেও ফাহিমকে জাগানো হয় না সাহারীতে। সে প্রতিনিয়তই তার মাকে জড়জড় কণ্ঠে ক্লান্তিহীন বলতে থাকে, আম্মু! আমিও ছিয়াম রাখব! আমিও ছিয়াম রাখব! তার আম্মু মাথায় হাত রেখে আশ্বস্ত করে বলেন, হ্যাঁ, আব্বু! তুমিও ছিয়াম রাখবে, আরেকটু বড় হও।

কিন্তু ফাহিম এমন কথা শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তার আম্মুর এমন সান্ত্বনামূলক কথা শুনে কান্নার হাট বসিয়ে দিল। ছেলের এমন অবিরাম কান্না দেখে মা বললেন, ঠিক আছে, আব্বু! আর কাঁদতে হবে না। ইশ! কেঁদে চোখটা লাল করে ফেলেছে। তোমাকেও আমরা কাল থেকে সাহারীর সময় ঠিকই উঠাব।

ফাহিমের মুখে মিষ্টি হাসি শোভা পেল। কিন্তু ফাহিমের জীবনে কাল সকাল আসতে বহু দেরি হলো। ইতোমধ্যে তার মাকে আরও বেশ কয়েকবার বলা হয়ে গেছে। তার বোনকেও বলতে বাদ রাখেনি। তবুও কেউ কথা দিয়ে কথা রাখে না—এমনটাই মনে করে ফাহিম।

আজ পঞ্চম ছিয়াম। ফাহিমের উঠতে আজ আর দেরি হয়নি। একদম যথাসময়ে ঠিক যেন আজ সে এলার্ম দিয়ে রেখেছিল। এটা দেখে তার পরিবারের সবার চোখ চড়কগাছ হয়ে গেছে।

ফাহিমের এই ছোট্ট বয়সেই ছিয়াম রাখার প্রতি আলাদা একটা ভালোবাসা ছিল। সে ছিয়াম রাখার অশেষ নেকীর কথা জানত। এর ফযীলত আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে দিবেন—এ কথাও তার জানার বাইরে ছিল না। তার শিক্ষকের মুখে রামাযানের আগের দিনই এ কথাগুলো শুনেছে সে। তার সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের নরম পাপড়ির ন্যায় হৃদয়মূলে বেশ ভালোভাবেই গেঁথে আছে কথাগুলো। সে তার শিক্ষকের কাছে শুনেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ‘বনূ আদমের (মানুষের) প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য, কিন্তু শুধু ছিয়াম আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দিব’।[১২১] তাছাড়া এই হাদীছের শেষের দিকে বলা হয়েছে, ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ

১২০. ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৫।

১২১. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১।

فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ‘সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরির ঘ্রাণ অপেক্ষা অধিক পবিত্র ও প্রিয়’।

ছিয়াম পালনকারীর অগাধ আনন্দ মেলে ইফতারে। ছিয়াম পালনকারীদের ইফতারে আনন্দের সীমা থাকে না। দীর্ঘক্ষণ পদব্রজে চলার পর ধুধু মরুভূমির বুকে এক ফোঁটা পানি যেভাবে পথিকের শুষ্ক বদনে আনন্দের হাসি ফিরিয়ে দেয়, ইফতারে তার চেয়েও বেশি আনন্দ এসে জমা হয় ক্লান্ত হৃদয়ের পাটাতনে। যেন হৃদয়াকাশে মেঘহীন বাদল নামে!

সত্যিই হৃদয়ে প্রশান্তি মেলে যখন দেখি বেলাশেষে সূর্যরশ্মিরও কোনো তেজ নেই, ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে, কতশত ছিয়াম পালনকারী ইফতারী সামনে নিয়ে বসেছে। নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে হাতের তালুর মতো বিছানো পৃথিবীতে শিকলমুক্ত আকাশের নিচে সারাদিনের ক্লান্তি ঘোঁচাবে। ইফতারে দিনের ক্লান্ত হৃদয় প্রশান্তি পায়। সাদা পানি আর খেজুরে তৃপ্তি আসে অন্তরে। সেই সীমাহীন আনন্দের কথা হাদীছের পাতাতেও মেলে। হাদীছে এসেছে,لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ‘ছিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে দুটি আনন্দমুহূর্ত— একটি ইফতারের সময়, আরেকটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়’।[১২২]

এগুলো শোনার পরেই ফাহিমের মধ্যে ছিয়াম রাখার স্পৃহা আরও শতগুণ বেড়ে যায়। ফাহিমের সাত সকালে কিছু না খেলে চলেই না। ছোট্ট ছেলে গায়ের হাড্ডিগুলো যেন গুনতে ভুল হবে না। এককথায় সে একটা তালপাতার সেপাই। আজ তার প্রথম ছিয়াম।

দিনের এক-প্রথমাংশ প্রায় কেটেই গেছে। রৌদ্রের তাপটাও একটু প্রখর হয়েছে। তার গলাও এতক্ষণ শুকিয়ে যাওয়া খালের মতো হয়ে গেছে। গতকালের কেনা একটা ক্যান্ডি অবশিষ্ট ছিল তার কাছে। সেটাই খপ করে মুখে পুরে দিল। পরক্ষণেই তার স্মরণে এলো ছিয়ামের কথা। অ্যাঁ! আমি তো ছিয়াম রেখেছি।

সে তার পুরো কাহিনিটা আম্মুকে জানায়। তার আম্মু এই ভুলবশত খেলে ছিয়ামের কোনো কমতি বা ক্ষতি হয় না—এ কথা জানান। হাদীছে এসেছে,مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ‘যে ব্যক্তি ছিয়াম অবস্থায় ভুল করে কিছু খেয়ে ফেলল বা পান করল, সে যেন তার ছিয়াম পূর্ণ করে নেয়। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন’।[১২৩]

এটা শোনার পর ফাহিমের খুশির আর সীমা থাকে না। তার ছিয়াম ভাঙেনি বলে মিছিল শুরু করে তার বোনের কাছে যায়।

এভাবেই দুপুর গড়িয়ে বিকাল নামে। এদিকে ফাহিম ঘড়ির কাটার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সময় যেন দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। কিছুতেই তার ইফতারের সময় হচ্ছে না। এভাবে আর সাত মিনিট, আর পাঁচ মিনিট গুনতে গুনতেই আযানের ধ্বনি এসে পৌঁছে ফাহিমের কানে। অনাবিল আনন্দ আর বুকভরা প্রশান্তি নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে পানি মুখে দেয়। আজ কে দেখবে তার আনন্দ। তার ছোট্ট মুখে মিষ্টি হাসি ধরে রাখার মতো জায়গা নেই। তারপর তার আম্মুর সাথে সাথে এই দু‘আ পাঠ করে, ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ ‘পিপাসা দূর হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ছওয়াব ধার্য হলো!’ এভাবেই ফাহিমের প্রথম দিনের ছিয়ামের সমাপ্তি ঘটল।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! আর কতকাল গা ভাসিয়ে সময়ের স্রোতে ভেসে যাবেন? কেন আপনি অবহেলায় কাজের বাহানা দিয়ে ছিয়াম ছেড়ে দিবেন? ছিয়ামের ফযীলত যে অপরিসীম। হাদীছে এসেছে, الصِّيَامُ جُنَّة ‘ছিয়াম ঢালস্বরূপ’।[১২৪] যা মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে।

ছিয়ামের ফযীলতের কথা বলতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেন, إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ‘জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে ক্বিয়ামতের দিন ছাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, ছওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।[১২৫] সুবহানাল্লাহ!

মহান আল্লাহ আমাদের পরিপূর্ণ গুরুত্ব সহকারে ছিয়াম পালন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১২২. ছহীহ বুখারী, হা/১৮০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১।
১২৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৬৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৫।
১২৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১।
১২৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৬।

কবিতা

আহলান ওয়া সাহলান

-সাদিয়া আফরোজ
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

এলো আবার বছর ঘুরে
নেকী কামাইয়ের মৌসুম,
মুমিনদেরই কণ্ঠ জুড়ে
প্রভুর প্রেমের গুনগুন।
লাওহে মাহফূয সিক্ত হলো
কুরআনে কারীম পেয়ে,
জাহেলিয়্যাতের ঘটল ইতি
নবীর নির্দেশনা পেয়ে।
রামাযানের সাধনা ভাই
শান্তি দেয় মুমিনকে,
কুরআনের জ্যোতি শুদ্ধি
করে পাপ আত্মাকে।

সাদরে গ্রহণ রামাযান

-মুরসালিন বিন শরিফুল ইসলাম
শিক্ষার্থী, ৯ম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

বিশ্ব মুসলিম একটি মাসের গুনছিল প্রতীক্ষার প্রহর
তা এসেছে তাদের দরবারে ঘুরে একটি বছর।
আধখানা চাঁদ গগনে হাসিমুখে দিয়েছে দেখা
তাই বিশ্ব মুসলিমের কপোলে চমকাচ্ছে খুশির রেখা।
প্রভুর দেওয়া অপার সওগাত সেরা মাস রামাযান
বিশ্ব মুসলিমকে আল্লাহর ক্ষমার পানে করছে আহ্বান।
ফজরে সাহারী খেয়ে দিন কাটবে পাপ বর্জনে
থাকবে নাকো হিংসা-বিদ্বেষ দিন যাবে পুণ্য অর্জনে।
পবিত্র চিত্তে নিষ্ঠার সাথে করবে সবে ইবাদত
মুখে থাকবে নাকো অশ্লীল কথা জিহ্বা করবে হেফাযত।
হৃদয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন দিনেরবেলা থাকবে ছিয়াম
চিত্তে আল্লাহর ভয় নিয়ে রাতে সবে করবে ক্বিয়াম।
গভীর নিশিতে হস্তদ্বয় প্রভুপানে করবে উত্তোলন
ক্ষমা করো 'ইয়া রাব্বী, ইয়া রাব্বী' বলে করবে সম্বোধন।
আছে সবে প্রতীক্ষায় শেষ দশকে করবে ই'তিকাফ
প্রভু যেন অনুগ্রহের দরিয়া দিয়ে করেন তাদের মাফ।
হে প্রভু! মোরা পাপী এগারোটি মাস যত করেছি পাপ
এই উপহারের দ্বারা মোদের সব গুনাহ করে দাও মাফ।

ছিয়ামের মাহাত্ম্য

-মো. আবু বকর সিদ্দিক
ছায়ামঞ্জিল, পূর্ববাসাবাটী, বাগেরহাট।

প্রভুর ভয়ে ভীত হৃদয় গড়ার প্রয়োজনে,
ছিয়াম রাখা ফরয হলো পবিত্র রামাযানে।
মহান স্রষ্টার বিশ্বাস ও ভয় থাকবে যে বান্দার,
সে বান্দা পারে না কভু করতে পাপাচার।
আল্লাহ তাআলা সর্বদ্রষ্টা সদা বিরাজমান,
এ আক্বীদা গড়ার জন্য হুওমের ফরমান।
ছিয়াম রেখে বান্দা যখন আল্লাহভীরু হবে,
ছিয়ামের অসীলায় সকল গুনাহ মুছে যাবে।
ছায়েমগণ মহান প্রভুর বিশেষ মেহমান,
তাদের জন্য প্রস্তুত আছে শ্রেষ্ঠ দ্বার রাইয়ান।
শুদ্ধচিত্তে ছিয়াম রাখলে পুণ্য বেশুমার,
প্রভু স্বয়ং নিজে দিবেন ছিয়ামের পুরস্কার।

শীতের মৌসুম

-মিজানুর রহমান
মাহমুদপুর, মেলান্দহ, জামালপুর।

হাড় কাঁপানো শীত এসেছে
বাংলার ঘরে ঘরে,
নানান রকম শীতের পিঠা
খাচ্ছি মজা করে।
যাচ্ছি দূরে ঘুরতে আবার
পাচ্ছি মজা খুব,
শীতের প্রতি সত্যি আমার
ভীষণ রকম লোভ।
শীতের মৌসুম ভালোবাসি
হালকা হিমেল হাওয়া,
খুব আদরে উষ্ণ ভরে
লম্বা ঘুমে যাওয়া।

সংবাদ

বাংলাদেশ সংবাদ

প্রকাশ্যে ধূমপানে ২০০০ টাকা জরিমানা, তামাক নিয়ন্ত্রণে ৯টি কঠোর নির্দেশনা

তামাক ও নিকোটিনজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগণকে সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যমান 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' আরও শক্তিশালী করেছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রস্তাবিত 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' ৩০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে কার্যকর হয়েছে।

সংশোধিত আইনে ই-সিগারেট, ভ্যাপ, হিটেড টোব্যাকোসহ সব উদীয়মান তামাকপণ্যকে তামাকজাত দ্রব্যের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকার প্রয়োজনে গেজেটের মাধ্যমে নতুন পণ্যকে তামাকজাত দ্রব্য হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে।

সব পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহনে ধূমপান এবং তামাক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ আইন লঙ্ঘনে জরিমানা ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন, সোশ্যাল মিডিয়া ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তামাকের সব ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খেলার মাঠ ও শিশুপার্কের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ই-সিগারেট ও অন্যান্য উদীয়মান তামাকপণ্য উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে, যার শাস্তি সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা জরিমানা।

এ ছাড়া কুম্ভি পাতা ও টেন্ডু পাতার বিড়ি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং পৃথক 'বিড়ি উৎপাদন নিষেধাজ্ঞা অধ্যাদেশ, ১৯৭৫' বাতিল করা হয়েছে। তামাকের সঙ্গে ক্ষতিকর আসক্তিমূলক দ্রব্য মেশানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্যাকেটের ৭৫ শতাংশ জায়গাজুড়ে রঙিন স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা ও স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আইন প্রয়োগে জরিমানা ও কারাদণ্ড বাড়ানো হয়েছে, প্রয়োজনে লাইসেন্স বাতিল ও মালামাল জব্দের বিধানও যুক্ত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

হিজাবকাণ্ড: চাকরিতে যোগ দিলেন না পারভীন

ভরা মঞ্চে তরুণী চিকিৎসকের হিজাব টেনে নামিয়েছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তাঁর এই আচরণ ঘিরে তীব্র বিতর্ক দানা বাঁধে রাজনৈতিক মহলে। অনেকে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে বলে কটাক্ষ করেন। এবার সেই তরুণী চিকিৎসক যোগ দিলেন না চাকরিতে। সূত্রের খবর, গত ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ ইং, রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাজে যোগদান করেননি মহিলা চিকিৎসক নুসরাত পারভীন। কাজে যোগদানের শেষ সময় ২০ ডিসেম্বরের পর আরও বাড়ানো হয়। এদিকে নুসরাত পারভীনকে মাসিক ৩ লাখ টাকা বেতনে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছেন ঝাড়খণ্ড সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ইরফান আনছারী বলেন, বিহারে মহিলা চিকিৎসক ডা. নুসরাত পারভীনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অমানবিক ও লজ্জাজনক ঘটনা পুরো দেশকে নাড়া দিয়েছে। হিজাব টেনে নামানো শুধু একজন নারীকে অপমান নয়, এটি সংবিধান ও মানবতাকেও অপমান। মহিলার হিজাব খুলে দেওয়ার পর তিনি অস্বস্তিবোধ করছেন। মঞ্চজুড়ে হাঁসিঠাট্টা দেখে নিজেকে অপমানিতবোধ করছেন মহিলা। গোটা ঘটনার ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই দেশজুড়ে তীব্র নিন্দার ঝড় ওঠে।

মুসলিম বিশ্ব

গাযায় অঙ্গহীন ৬ হাজার মানুষের জরুরী পুনর্বাসন প্রয়োজন

ইসরাঈলের অব্যাহত হামলায় গাযায় প্রায় ৬ হাজার অঙ্গহীন মানুষের জরুরী ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন প্রয়োজন বলে জানালো গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তারা জানায়, পরিস্থিতি ভয়াবহ; অঙ্গহারানোদের মধ্যে ২৫ শতাংশই শিশু, যারা অল্প বয়সেই আজীবন প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েছে। মন্ত্রণালয় জানায়, হাজারো আহত বেসামরিক মানুষ শারীরিক যন্ত্রণা ছাড়াও গভীর মানসিক ও সামাজিক সংকটে ভুগছেন। তাদের জন্য টেকসই পুনর্বাসন, মানসিক সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষা এখন জরুরী। জাতিসংঘের সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজ্জারিনি আগেই জানিয়েছেন, বর্তমান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গাযায় বিশ্বের সর্বোচ্চ শিশু অঙ্গচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে চলমান হামলায় ৭০ হাজারের বেশি নিহত, আর ১ লাখ ৭০ হাজারের বেশি আহত হয়েছেন। যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও আগে সহায়তা বিতরণে বাধা, খাদ্যকেন্দ্রে হামলা এবং দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করেছে। ইসরাঈল এখন আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের মুখোমুখি।

সঊদী আরবে চলতি বছরে রেকর্ড মৃত্যুদণ্ড, কার্যকর ৩৪০ জনের সাজা

এক বছরে সর্বাধিক মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নতুন রেকর্ড গড়ল সঊদী আরব। বার্তা সংস্থা এএফপি-র হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ৩৪০ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। পরে আরও তিনজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা জানিয়েছে সঊদী কর্তৃপক্ষ। এর ফলে টানা দ্বিতীয় বছর নিজেদের আগের রেকর্ড ভাঙল দেশটি। এএফপি জানাচ্ছে, মানবাধিকার সংগঠনগুলো ১৯৯০-এর দশক থেকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পরিসংখ্যান নথিভুক্ত করা শুরু করার পর এটাই সর্বোচ্চ সংখ্যা। এর আগে ২০২৪ সালে সঊদী আরবে ৩৩৮ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল, যা তখন পর্যন্ত সর্বাধিক হিসেবে নথিভুক্ত ছিল। চলতি বছরের পরিসংখ্যান সেই রেকর্ডও ছাপিয়ে গেল।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

পৃথিবীর ঘূর্ণন থেকে তৈরি হলো বিদ্যুৎ, যন্ত্র গড়ে ফেললেন বিজ্ঞানীরা!

পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখালেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। নিউ জার্সিতে নাসার গবেষণাগারে পৃথিবীর আবর্তন গতি ও চৌম্বক ক্ষেত্র নিয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা চালিয়ে তাঁরা অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই গবেষণার নেতৃত্ব দেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্পদার্থবিদ ক্রিস্টোফার এফ চাইবা। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের ভেতর একটি বিশেষ আকৃতির পরিবাহী ব্যবহার করলে প্রচলিত তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। পরীক্ষায় ম্যাঙ্গানিজ-জিঙ্ক ফেরাইট দিয়ে তৈরি এক ফুট লম্বা ফাঁপা সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। সিলিন্ডারটিকে পৃথিবীর অক্ষের মতো ৫৭ ডিগ্রি কাত করে উত্তর-দক্ষিণমুখী রাখা হলে এর দুই প্রান্তে কয়েক লক্ষ মাইক্রোভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

যদিও উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমাণ এখনো খুবই সামান্য এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহারযোগ্য কি না, তা নিশ্চিত নয়, তবু গবেষকেরা মনে করছেন এটি ভবিষ্যতের শক্তির উৎস নিয়ে নতুন দিক দেখাল। যদি এই প্রযুক্তি আরও উন্নত করা যায়, তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে একদিন বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

সওয়াল-জওয়াব

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): কাফেরদের সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা কী হবে? তারা কি চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, নাকি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন? কেননা আল্লাহ বলেছেন, শিরক ব্যতীত সমস্ত পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।

-সিয়াম

আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: কাফের বলতে অমুসলিমকে বুঝায়, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে স্বীকৃতি দেয়নি। তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে; তারা সেখানে কোনো অভিভাবকও পাবে না, কোনো সাহায্যকারীও পাবে না’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৬৪-৬৫)*।

প্রশ্ন (২): জান্নাতে পুরুষ ও নারীর বয়স কত হবে? সেখানে কি পরিবারের সব সদস্য তথা ছেলে, বাবা ও দাদা সমবয়সী হবে?

-আবূ সুফিয়ান

ডিমলা, নীলফামারী।

উত্তর: জান্নাতবাসীরা ৩৩ বছর বয়সের হবে, নারী হোক বা পুরুষ, বাবা হোক বা দাদা এবং নারীরা সমবয়সী হবে *(তাফসীরে কুরতুবী, ১৭/২১১; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৯৩৩)*। মনে রাখতে হবে, জান্নাত পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি ও মানুষের সীমিত চিন্তাভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা তার চেয়েও অধিক উত্তম।

প্রশ্ন (৩): আমার মামাতো বোন পালিয়ে এক ছেলেকে বিয়ে করেছে। তাকে তার হাসবেন্ড থেকে আলাদা করার জন্য কবিরাজ এর মাধ্যমে জাদু করা হয়। কবিরাজ কিছু একটা জিনিস দিয়েছিল। সেটা কবরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বলেছিল। তখন আমার মামা আর আমি কবরস্থানে গিয়ে কবরের ভিতর এটা ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। আমি যেতে চাইনি, আমার মামা বাধ্য করেছিল তার সাথে যেতে। এতে কি আমার পাপ হবে? আমার মামা কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছে। এখন তার জন্য কোনো কিছু করার আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ইসলামী শরীআতে জাদুকে কঠোরভাবে হারাম করা হয়েছে এবং তা ঈমান ভঙ্গের কারণ। তাতে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, এমনকি বাধ্য হয়েও অংশগ্রহণ করা যাবে না। যদি কেউ কোনোভাবে জাদুর সাথে জড়িত হয়ে থাকে বা তাতে সহযোগিতা করে, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করে নিতে হবে *(আল-বাকারা, ২/১০২)*। আর কোনো ব্যক্তি যদি জাদু করে বা জাদুতে বিশ্বাস করে তার দ্বারা সহযোগিতা নিয়ে মারা যায়, তাহলে তার জন্য জীবিতদের করণীয় হচ্ছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তার পক্ষ থেকে দান-খায়রাত করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৪): স্বপ্নের ব্যাখা করা যাবে কি? রাসূল ﷺ-এর পরে বর্তমানে কারো কাছে স্বপ্নের ব্যাখা জানা যাবে কি? এমন কোনো বই আছে কি যাতে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখা দেওয়া আছে?

-হাসনা বেগম

রাজশাহী।

উত্তর: (ক) স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা জায়েয। রাসূল ﷺ ছাহাবীদের স্বপ্নের বিবরণ শুনতেন এবং এর ব্যাখ্যা করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮৬)*। (খ) যদি ভালো স্বপ্ন হয় তাহলে এমন ব্যক্তির কাছে তা প্রকাশ করা যাবে, যাকে স্বপ্নদ্রষ্টা পছন্দ করে এবং সে তার কল্যাণকামী *(ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬১)*। হিংসুক ব্যক্তির কাছে ভালো স্বপ্নের বিবরণ প্রকাশ করা যাবে না *(ইউসুফ, ১২/০৫)*। বর্তমানেও কাউকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা যাবে, তবে যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। কারণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারা আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা, এটা মেহনত করে অর্জন করা কঠিন। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এবং যাতে আমি তাকে (ইউসুফকে) শিক্ষা দিই স্বপ্নের ব্যাখ্যা’ *(ইউসুফ, ১২/২১)*। সুতরাং স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করার পূর্বে ব্যক্তিকে ভালোভাবে যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে বিখ্যাত স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী, তাবেঈ মুহাম্মাদ বিন সীরীন রাহিমাহুল্লাহ-এর গুণাবলিকে মানদণ্ড হিসেবে রাখা যেতে পারে। আর যদি মন্দ স্বপ্ন হয়, তাহলে তা প্রকাশ করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন এবং যেটা করণীয় তা বলে দিয়েছেন।

সেটা হলো মন্দ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙার পর তাৎক্ষণিক বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলা এবং শয়তান ও স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা *(ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬১)*। (গ) এমন কোনো নির্দিষ্ট বই নেই যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা লেখা আছে। তবে এমন বই পাওয়া যায় যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদের বিভিন্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যার বিবরণ রয়েছে। এসব স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার সাথে নিজের স্বপ্নকে মেলানো যাবে না। কারণ স্থান, কাল ও পাত্রভেদে একই রকম স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে। মনে রাখতে হবে, স্বপ্ন কোনো দলীল নয়।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৫): আলহামদুলিল্লাহ! আমার যমজ ৩টি সন্তান হয়েছে। ২ মেয়ে ও ১ ছেলে, ওদের বয়স এখন ৫ মাস ১০ দিন। ৩টি বাচ্চা পালন করা তো কিছুটা হলেও ওদের আম্মুর জন্য কষ্ট হচ্ছে, তবুও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অনেকটা সহজ করে দিচ্ছেন। কিন্তু ৩ জনের প্রস্রাব-পায়খানা থেকে ওদের আম্মু কোনোভাবেই নিজেকে পবিত্র রাখতে পারছে না। এক্ষেত্রে সে কীভাবে পবিত্র থাকবে? এমতাবস্থায় তার ছালাতের বিধান কী?

-মো. বদরুল ইসলাম

আড়ুয়াবর্নি চড়পারা, চিতলমারী, বাগেরহাট, খুলনা।

উত্তর: বাচ্চা প্রসবের পর মহিলারা প্রসব-পরবর্তী রক্তপাতের সময় (সর্বোচ্চ ৪০ দিন পর্যন্ত) নিফাস অবস্থায় থাকেন। এসময় তারা ছালাত, ছিয়াম থেকে বিরত থাকবেন *(তিরমিযী, হা/১৩৯)*। তবে পরবর্তীতে ছালাত, ছিয়াম আদায় করতে হবে। সেক্ষেত্রে ছেলে শিশু, যে দুধ ব্যতীত অন্য কিছু খায় না, সে ব্যতীত অন্য যারই পেশাব কাপড়ে লাগবে সেই কাপড় ধৌত করতে হবে। আর ছেলে শিশু হলে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে *(আবূ দাঊদ, হা/৩৭৫)*। সম্ভবপর পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টা করবে।

ছালাত

প্রশ্ন (৬): মসজিদে গিয়ে দেখি ফরয ছালাতের জামাআত শেষ হয়েছে, এখন জানাযা হবে। তখন ফরয ছালাতের আগে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-শাহিদুল ইসলাম

কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: কোনো ব্যক্তি ফরয ছালাতের জামাআত শেষ হয়ে মসজিদে উপস্থিত হলে জানাযার ছালাত ইমামের সঙ্গে আগে আদায় করবে, কারণ ফরয ছালাত পরে আদায় করার সুযোগ আছে; কিন্তু জানাযার ছালাত একবারই পড়া হয়, এরপর তারা লাশ নিয়ে চলে যায় *(মাজমূ‘ ফাতাওয়া শায়খ ইবনু উছায়মীন, ১৭/১১৫)*। একজন মুসলিমের জন্য সুন্নাত হলো সে যতগুলো জানাযা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলো সবগুলো জানাযার ছালাত আদায় করা; যদিও জানাযার সংখ্যা বেশি হয়। কেননা শরীআত এতে অত্যন্ত বড় ছওয়াব নির্ধারণ করেছে, যা কোনো মুসলিমের অবহেলা করা উচিত নয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত থাকে এবং তার জানাযার ছালাত পড়া পর্যন্ত থাকে, তার জন্য এক কিরাত ছওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত থাকে, তার জন্য দুই কিরাত ছওয়াব রয়েছে’। বলা হলো দুই কিরাত কী পরিমাণ? তিনি বললেন, ‘দুটি বিশাল পাহাড়ের সমান’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৩২৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৪৫)*।

প্রশ্ন (৭): নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘‘কিয়ামতের আলামত হচ্ছে লোকেরা মসজিদে ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে চলে যাবে কিন্তু তাতে দু’রাকাত ছালাত আদায় করবে না’ উক্ত হাদীসটি কি সহীহ?

হাসিবুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর: উক্ত হাদীছটি ছহীহ। হাদীছটি হলো, «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ» রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে, লোকেরা মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে চলে যাবে। অথচ তাতে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে না এবং পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে সালাম প্রদান করবে না’ (ছহীহ ইবনে খুযাইমা, হা/১৩২৬; শুআবুল ঈমান, হা/৪৩৯৯; সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহা, হা/৬৪৯; জামেউছ ছগীর, হা/১০৮৩৮)।

প্রশ্ন (৮): অন্তরে ছালাতের প্রতি অনীহা, কিন্তু আল্লাহর শাস্তির ভয়ে নিজেকে ছালাতে বাধ্য করেছি। এতে কি আমার আমল কবুল হবে বা এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-আব্দুল করিম

ধুলিহর, সাতক্ষীরা।

উত্তর: যদি কারো ছালাতে অনীহা থাকে, তাহলে এর ফলাফল ভালো নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কাজেই দুর্ভোগ সে ছালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন’ *(আল-মাঊন, ১০৭/৪-৫)*। তিনি আরো বলেন, ‘আর যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়,

তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে' *(আন-নিসা, ৪/১৪২)*। তবে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ছালাত আদায় করলেও তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে এবং উক্ত ছালাতই তাকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রেখে ছালাতের প্রতি একাগ্রতা আনয়ন করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*। ছালাতে একগ্রতা আনয়ন এবং অন্তরের অনীহা দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করা, হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর স্থির রাখুন। এছাড়া ছালাতের ক্বিরাআত ও তাসবীহ-তাহলীল বুঝে বুঝে পড়া এবং পাপের কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

ছিয়াম-রামাযান

প্রশ্ন (৯): রামাযানের প্রস্তুতিস্বরূপ একজন মুসলিমের জন্য কী কী করা উচিত?

-আশিক বাবু
ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: রামাযানের আগমনে একজন মুসলিমের আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। রামাযানের প্রস্তুতির জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু আমল হলো- ১. রামাযানের প্রস্তুতিস্বরূপ শা'বান মাসে বেশি বেশি ছিয়াম পালন করা। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রামাযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পুরো মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬)*। ২. তওবা করা। আল্লাহর হক্ব ও বান্দার হক্ব নষ্টের ব্যাপারে যে গুনাহগুলো আছে সেগুলো থেকে তওবা করে পূত-পবিত্র মন নিয়ে বরকতময় মাসে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো *(আন-নূর, ২৪/৩১)*। ৩. কোনো কাযা ছিয়াম থেকে থাকলে তা পূর্ণ করা *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৬)*। এ মাসে অনেক ইবাদত আছে। তার প্রথম ইবাদত হলো ছিয়াম রাখা *(আল-বাকারা, ২/১৮৩)*। ৪. কিয়ামুল লায়ল করা। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কিয়ামুল লায়ল করবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৭)*। এছাড়াও খাবার খাওয়ানো, ই'তিকাফ করা, ছাদাক্বা করা, কুরআন তেলাওয়াত করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (১০): রামাযান মাসে যদি কারো কোনো পরীক্ষা থাকে। একারণে সেদিন ছিয়াম না রেখে তার ক্বাযা আদায় করা যাবে কি?

-বাবলু
গাইবান্ধা।

উত্তর: পরীক্ষা বা এরকম কোনো স্বাভাবিক কারণে ছিয়াম ছাড়া যাবে না। কেননা ছিয়াম ফরয বিধান, যা শরীআতে বর্ণিত কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে পরিহার করা যাবে না; করলে বড় গুনাহ হবে। তবে কেউ যদি না বুঝে এরূপ করে ফেলে, তাহলে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং সেই ছিয়ামের স্থানে ক্বাযা ছিয়াম পালন করবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তির ছিয়াম অবস্থায় (অনিচ্ছায়) বমি হবে তার ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে না। আর যে ব্যক্তি গলার ভিতর আঙুল বা অন্য কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে ইচ্ছাকৃত বমি করবে তাকে ক্বাযা আদায় করতে হবে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩৫১৮)*।

প্রশ্ন (১১): ছিয়াম অবস্থায় লালা বা থুথু গিলে ফেললে ছিয়াম ভেঙ্গে যাবে কি?

-জিন্নাত আলী
রাজশাহী।

উত্তর: ছিয়াম অবস্থায় লালা বা থুথু গিলে ফেললে ছিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা এগুলো মুখের সাধারণ থুথুর মতো, যা মুখের সাধারণ পানি। এমনকি যদি কেউ থুথু মুখের মধ্যে একত্রিত করে গিলে ফেলে তাতেও ছিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা এগুলো বাহিরের এমন কোনো বস্তু নয় যা ভিতরে প্রবেশ করেছে, সুতরাং এগুলো খাদ্য হিসাবে গণ্য হবে না। আমের ইবনু রাবীআ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ছিয়াম অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রতিবার ওযূর সময়ই আমি তাদের মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু ও যায়েদ ইবনু খালেদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সূত্রে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি ছায়েম ও যে ছায়েম নয়, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়াক করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আত্বা রাহিমাহুল্লাহ ও কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ছিয়াম অবস্থায় তার মুখের থুথু গিলে ফেলতে পারে *(ছহীহ বুখারী, 'ছিয়াম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৮)*।

প্রশ্ন (১২): মাইকে বা অন্য কিছুর মাধ্যমে ইফতার খাওয়ার জন্য মানুষকে ডাকা যাবে কি?

-বিলাল মুন্সি
পিরোজপুর।

উত্তর: ইফতার খাওয়ানোর জন্য মানুষকে ডাকার ব্যাপারে রাসূল ﷺ থেকে কোনো আমল পাওয়া যায় না। তবে দাওয়াতের মাধ্যমে বা স্বাভাবিকভাবে যারা উপস্থিত হবেন তাদেরকে ইফতার করানোর ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায়, তার জন্য রয়েছে ইফতারকারীদের সমান ছওয়াব এবং এজন্য তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না' *(ইবনু মাজাহ, হা/১৭৪৬; তিরমিযী, হা/৮০৭)*। তবে ইফতারের ব্যাপারে রাসূল ﷺ যা বলেন তাতে ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানোর জন্য যেকোনো মাধ্যমে ডাকা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করাবে অথবা কোনো গাযীর আসবাবপত্র ঠিক করে দেবে সে তাদের (ছায়েম ও গাযীর) সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে' *(মিশকাত, হা/১৯৯২)*। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্যণীয় হলো এর দ্বারা উদ্দেশ্য যেন লোক দেখানো না হয়।

প্রশ্ন (১৩): কোনো ব্যক্তি যদি রামাযান মাসে অনেক কঠিন ও কষ্টকর কাজের জন্য ছিয়াম না রাখে এবং এর জন্য ৩০ জন ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায়, তাহলে কি তার ছিয়ামের নেকী হবে?

-দিলদার হাওলাদার
নোয়াখালী।

উত্তর: কাজ কষ্টকর হওয়ার জন্য রামাযানের ছিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা রামাযানের ছিয়াম হলো ইসলামের রুকনগুলোর অন্যতম। প্রত্যেক মুকাল্লাফ ব্যক্তির জন্য এই মাসে ছিয়াম পালন করা ফরয *(আল-বাকারা, ২/১৮৩)*। শারঈ কোনো ওযর ছাড়া এই মাসে ছিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয নয় *(আল-বাকারা, ২/১৮৪)*। কিন্তু কাজ কষ্টকর হওয়ার জন্য ছিয়াম ভঙ্গ করা শারঈ কোনো ওযর নয়। তাই এই কারণে ছিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয হবে না; বরং এক্ষেত্রে উচিত হবে, ছিয়াম অবস্থাতে এমন কষ্টকর কাজ না করা। কিন্তু যদি এটি সম্ভব না হয়, তাহলে আখেরাতের প্রতিদানকে প্রাধান্য দিয়ে ছিয়াম পালন করবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যে কেউ আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক্ব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট' *(আত-ত্বালাক্ব, ৬৫/২-৩)*।

প্রশ্ন (১৪): গর্ভবতী মহিলাদের ছিয়ামের ব্যাপারে জানতে চাই।

-আনোয়ারা বেগম
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: নিজের ও বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে ছিয়াম পালন করবে। আর যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তারা ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং অন্য সময় করে নিবে। আল্লাহ অন্য সময় করার জন্য আদেশ করেছেন *(আল-বাকারা, ২/১৮৫)*। তবে তারাও ফকীর-মিসকীনকে ছিয়ামের পরিবর্তে খাদ্য দান করতে পারে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী, 'সামর্থ্যবান তারা মিসকীনদের ফিদিয়া প্রদান করবে'। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ। যদি তারা ছিয়াম রাখতে সমর্থ হয়, তবে ছিয়াম রাখবে; অন্যথায় প্রত্যহ একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা যদি সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কাবোধ করে, তবে তাদের জন্যও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়, তবে তারা ছিয়াম না রেখে (মিসকীনকে) খাদ্য খাওয়াতে পারে *(আবূ দাউদ, হা/২৩১৮)*।

প্রশ্ন (১৫): রামাযান মাসে এক রাকআত বিতর পড়া যাবে কি?

-আব্দুল করিম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: হ্যাঁ, পড়া যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'রাতের ছালাত দুই দুই রাকআত করে। অতঃপর যখন তুমি ছালাত শেষ করতে চাইবে, তখন এক রাকআত আদায় করে নিবে। তা তোমার পূর্ববর্তী ছালাতকে বিতর করে দিবে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৯৯৩)*। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে রাতের (নফল) ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'রাতের ছালাত দুই দুই রাকআত করে আদায় করবে। তবে ভোর হয়ে আসছে দেখলে এক রাকআত বিতর আদায় করে নিবে' *(ছহীহ বুখারী, হা/১১৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৪৯)*। তবে আট রাকআত তারাবীহ ও তিন রাকআত বিতর পড়াই বেশি ভালো *(ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩৮)*।

প্রশ্ন (১৬): ছিয়াম রেখে দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কেননা যে সকল কারণে ছিয়াম ভঙ্গ হয় স্বপ্নদোষ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া এটি মানুষের সাধ্যের বাইরে অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না' *(আল-বাকারা, ২/২৮৬)*।

প্রশ্ন (১৭): তারাবীহর ছালাতে কি ছানা পড়তে হবে?

-মারফিদুল ইসলাম
ফরিদপুর।

উত্তর: জানাযার ছালাত ব্যতীত সকল ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন বলতেন, 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বি-হামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা'। **অর্থ:** হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনার প্রশংসা করছি। আপনার নাম বরকতময়। আপনার মর্যাদা সমুন্নত। আপনি ছাড়া কোনো প্রকৃত উপাস্য নাই *(আবূ দাঊদ, হা/৭৭৬; নাসাঈ, হা/৮৯৯; মিশকাত, হা/৮১৫)*। কাজেই তারাবীহর ছালাতের প্রত্যেক শুরুর রাকআতে ছানা পড়তে হবে *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, ১/৪৪৯)*।

প্রশ্ন (১৮): পিতা মারা গেলে তার নামে ইফতার মাহফিল করা যাবে কি?

-শিশির আহমেদ
ঢাকা।

উত্তর: মৃত পিতা-মাতার নামে আমাদের সমাজে যে ইফতার মাহফিল ও ইফতারীর ব্যবস্থা করার প্রথা চালু আছে তা শরীআতসম্মত নয়। বিধায় তা করা যাবে না। বরং মৃত পিতা-মাতার নামে টাকা-পয়সা দান করতে হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা যে, তিনি কথা বলার সুযোগ পেলে দান করে যেতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি, তবে কি তিনি নেকী পাবেন? নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ' *(ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৪; মিশকাত, হা/১৯৫০)*।

প্রশ্ন (১৯): বিভিন্ন ক্যালেন্ডারে দেওয়া থাকে, রামাযান মাসের প্রথম ১০ দিন রহমতের, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফিরাতের এবং তৃতীয় ১০ দিন নাজাতের। কথাটি কি ঠিক?

-মোরসালিন
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: কথাটি ঠিক নয়। কারণ রামাযান মাসের প্রথম ১০ দিন রহমত, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফিরাত এবং তৃতীয় ১০ দিন জাহান্নাম থেকে নাজাত, মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ এবং একাধিক ছহীহ হাদীছ বিরোধী। যেমন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'রামাযান মাস আসলে রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯)*। অন্য আরেকটি হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'রামাযানের প্রথম রাত থেকেই একজন আহ্বানকারী বলতে থাকেন, হে কল্যাণকামী! অগ্রসর হও, হে অকল্যাণকামী! পিছু হটো। আর এভাবে রামাযানের প্রতি রাতেই আল্লাহ তাআলা কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন *(ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪২; তিরমিযী, হা/৬৮২; মিশকাত, হা/১৯৬০)*। উক্ত হাদীছদ্বয় ছাড়া অন্যান্য ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছেও রামাযান মাসকে এভাবে ভাগ করা হয়নি। সুতরাং পুরো রামাযানই রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস।

প্রশ্ন (২০): ফজরে জাগতে পারিনি, সূর্য উঠে গেছে। এ অবস্থায় কি ছিয়াম রাখতে হবে?

-আরাফাত কবির
ময়মনসিংহ।

উত্তর: এমতাবস্থায় ছিয়াম থাকতে হবে। কারণ দিনেও ছিয়ামের নিয়্যত করা যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে এসে বললেন, 'তোমার নিকট (খাবার) কিছু আছে কি?' আমি বললাম না, কিছুই নেই। তিনি বললেন, 'তাহলে আমি (আজ) ছিয়াম রাখলাম' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৪; তিরমিযী, হা/৭৩৩; নাসাঈ, হা/২৩২৭; আবূ দাঊদ, হা/২৪৫৫; মিশকাত, হা/২০৭৬)*। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, না খেয়েও ছিয়াম রাখা যায়।

প্রশ্ন (২১): ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক বা ব্রাশ করা যাবে কি?

-জমির উদ্দীন
ফেনী।

উত্তর: ছিয়াম অবস্থায় যেকোনো সময় মিসওয়াক বা দাঁতন করা যায়। মিসওয়াক করা যাবে না মর্মে সমাজে যে কথা প্রচলিত আছে, তা সঠিক নয়। বরং টুথপেস্ট কিংবা মাজন দিয়ে, কাঁচা অথবা শুকনা ডাল দিয়ে ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করা যাবে। এমতাবস্থায় মিসওয়াক কিংবা টুথপেস্ট, মাজনের স্বাদ আস্বাদন অনুভব হলেও ছিয়ামের ক্ষতি হবে না। কুরআন ও হাদীছে ওযূর সময় দাঁতন ব্যবহার করাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি। তবে ওযূতে নাকে পানি দেওয়ার বিষয়ে সাবধানতার কথা রয়েছে। সজোরে নাকে পানি টান

দেওয়া যাবে না। আমের ইবনু রাবীআহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ছিয়াম থাকাবস্থায় অসংখ্য বার মিসওয়াক করতে দেখেছি। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রতিবার ওযূর সময়ই আমি তাদের মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম। জাবের ও যায়েদ ইবনু খালেদ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর সূত্রে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি ছিয়াম পালনকারী এবং ছিয়াম পালনকারী নয়, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়াক করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আত্বা ও কাতাদাহ রাহিমাহুমাল্লা-হু বলেছেন, ছিয়াম পালনকারী তার মুখের থুথু গিলে ফেলতে পারে *(ছহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১; ছিয়াম অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২২): রামাযান মাসে অনেক নতুন নতুন বিদআত দেখা দেয়। এ ব্যাপারে জানতে চাই।

-গুলজার আলী
পাবনা।

উত্তর: রামাযান মাসে অনেক বিদআত আমল করা হয়। অথচ আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। নিম্নে কিছু বিদআত উল্লেখ করা হলো: (১) ইফতারের সময় দলবদ্ধভাবে দুই হাত তুলে দু'আ করা। (২) রামাযান মাসের শেষ শুক্রবার দলবদ্ধভাবে কবরস্থানে কবর যিয়ারত করা। (৩) ইফতারের সময় দেরি করে ইফতার করা। (৪) তারাবীহ ছালাতের শেষে দলবদ্ধভাবে দু'আ করা। (৫) ঈদের মাঠে কয়েকটি খুৎবা দেওয়া। (৬) ঈদের ছালাতের পর হাত তুলে মুনাজাত করা। (৮) মৃত ব্যক্তির নামে ইফতারের আয়োজন করা। (৯) নির্দিষ্টভাবে ঈদের দিন দলবদ্ধ হয়ে কবর যিয়ারত করা। এছাড়াও আরো অনেক বিদআত রয়েছে, যেগুলো রামাযান মাসে করা হয়। অথচ এগুলো পরিত্যাগ করা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদেরকে বিদআত থেকে দূরে রাখুন- আমীন!

প্রশ্ন (২৩): রামাযানে উমরা পালন করলে তার কোনো বিশেষ ফযীলত আছে কি?

-হাসিবুর রহমান
নওগাঁ।

উত্তর: নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষ্যমতে রামাযানে উমরা পালন করলে হজ্জের সমান নেকী হয়। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রামাযানে উমরা পালন করা হজ্জের সমতুল্য' *(মুসনাদে আহামদ, হা/২৮০৯; ইবনু মাজাহ, হা/২৯৯৪; মিশকাত, হা/২৫০৯)*।

প্রশ্ন (২৪): মৃত ব্যক্তির নামে করা ইফতার মাহফিলে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি?

-আকিব হোসেন
ঢাকা।

উত্তর: না, মৃত ব্যক্তির নামে দেওয়া ইফতারে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কেননা মৃত ব্যক্তির নামে যেটা প্রদান করা হয়, সেটি ছাদাকা। আর ছাদাকা সবাই খেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যাকাতের মাল ধনীদের জন্য হালাল নয়, সুস্থ সবলদের (খেটে খেতে সক্ষম) জন্যও নয়' *(আবূ দাঊদ, হা/১৬৩৪; তিরমিযী, হা/৬৫২)*। অতএব, মৃত ব্যক্তির নামে দেওয়া ইফতারীতে শুধুমাত্র দরিদ্ররা অংশগ্রহণ করবে।

প্রশ্ন (২৫): মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম করা যাবে কি? বিশেষ করে রামাযান মাসে?

-হান্নান মাসউদ
গাজীপুর।

উত্তর: রামাযান কিংবা রামাযানের বাইরে মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম করা শরীআতসম্মত নয়। মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন পড়ে বখশিয়ে দেওয়া স্পষ্ট বিদআত, এমন আমল আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে প্রমাণিত নয়। বরং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কেউ আমাদের এ শরীআতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা বাতিল' *(ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করল যা আমাদের ধর্মে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)*। বরং তার জন্য জীবিতদের করণীয় হলো দু'আ করা, তার জন্য ছাদাক্বা করা। এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আমার জননীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু ছাদাক্বা করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে ছাদাক্বা করলে তিনি এ ছওয়াব পাবেন কি? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ (অবশ্যই পাবে)' (ছহীহ বুখারী, হা/২২৯৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬১৯)।

প্রশ্ন (২৬): রামাযান মাসে জাহান্নামের শাস্তি বন্ধ থাকে- একথা কি ঠিক?

-তরিকুল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তর: ‘রামাযান মাসে জাহান্নামের শাস্তি বন্ধ থাকে’- কথাটি সঠিক নয়। কেননা এখনো পাপীদেরকে জাহান্নামে দেওয়া হয়নি। সেটা হবে বিচারের মাঠে। বরং জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে। আর এটা বলে মহান আল্লাহর এক বিশেষ দয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মাহে রামাযান শুরু হলে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়’। অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানকে শিকলবন্দি করা হয়’। অন্য বর্ণনায় আছে, ‘রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯, ৩২৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯; মিশকাত, হা/১৯৫৬)*। এর অর্থ হলো যে সমস্ত গুনাহ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, তা থেকে তাদের ইচ্ছাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া *(তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/২৯২)*।

প্রশ্ন (২৭): সফরে ছিয়ামের বিধান কী?

-মোমিনুল ইসলাম
লালমনিরহাট।

উত্তর: সফর অবস্থায় ছিয়াম রাখতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে ছাড়তেও পারে। হামযা ইবনু আমর আল-আসলামী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সফরের অবস্থায় ছিয়াম পালনের ক্ষমতা আমার রয়েছে। এ সময় ছিয়াম পালন করলে আমার কোনো গুনাহ হবে কি? তিনি বললেন, ‘এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ অবকাশ, যে তা গ্রহণ করবে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি কেউ ছিয়াম পালন করতে চায়, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না’। অপর বর্ণনায় তিনি আরো বলেন, ‘যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে ছওম পালন করো আর যদি ইচ্ছা হয়, তবে ছওম ছেড়ে দাও’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/১১২১)*।

প্রশ্ন (২৮): ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন নেওয়া যাবে কি?

-আব্দুত তাওয়াব
বরিশাল।

উত্তর: যেসব ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো ছিয়াম অবস্থায় রোগমুক্তির জন্য গ্রহণ করা যাবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিয়াম অবস্থায় (রোগমুক্তির জন্য) শিঙ্গা লাগাতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৮; ইরওয়াউল গালীল, হা/৯৩২)*। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগাতে নিষেধ করতেন। কিন্তু পরে আবার অনুমতি প্রদান করেছেন *(দারাকুত্বনী, হা/৭; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৮০৮৬, সনদ ছহীহ)*। তবে যেসব ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় বা শরীরে শক্তি জোগায় তা গ্রহণ করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (২৯): ‘ইফতারীর পূর্ব মুহূর্তে দু‘আ কবুল হয়’ এমন কোনো কথা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?

-সলিমুল্লাহ
রাজশাহী।

উত্তর: ‘ইফতারীর পূর্ব মুহূর্তে দু‘আ কবুল হয়’ মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৩)*। বরং রামাযান মাসের পুরো সময়টাই দু‘আ কবুলের সময়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘রামাযান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্টু জিনদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয় এবং এর দরজাও তখন আর খোলা হয় না, খুলে দেওয়া হয় জান্নাতের দরজাগুলো এবং এর একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। (এ মাসে) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন, হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত! বিরত হও। আর বহু লোককে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক রাতেই এরূপ হতে থাকে’ *(তিরমিযী, হা/৬৮২; ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪২; মিশকাত, হা/১৯৬০)*। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘রামাযান মাস উপস্থিত হলে রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯, ৩২৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯; মিশকাত, হা/১৯৫৬)*। তাই শুধু ইফতারীর পূর্ব মুহূর্তে নয়, বরং রামাযান মাসের যে কোনো সময় দু‘আ করলে আল্লাহ তা কবুল করবেন, ইন-শা-আল্লাহ!

প্রশ্ন (৩০): রামাযান মাসে ইফতারীর পূর্বে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু‘আ করার বিধান কী?

-উসমান গনী
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা দু‘আ করার বিষয়টি প্রমাণিত হলেও ইফতারীর পূর্বে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু‘আ করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তা সুস্পষ্ট বিদআত বা সমাজে প্রচলিত নব আবিষ্কৃত আমল। দ্বিতীয়ত নির্দিষ্টভাবে ইফতারীর সময় দু‘আ কবুল হয় মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৩; মিশকাত, হা/২২৪৯)*। ইফতারীর পূর্ব মুহূর্তে দু‘আ কবুল হয়-এ কথার বিশ্বাস আল্লাহর ক্ষমাকে সংকীর্ণ করে দেয়। কেননা রামাযানের ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তি ছিয়ামরত অবস্থায় যে কোনো মুহূর্তে দু‘আ করলে আল্লাহ তার দু‘আ প্রতিটি মুহূর্তে

কবুল করে থাকেন *(ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫২)*। সুতরাং কেবল ইফতারীর সময়ই নয়, বরং ছিয়াম অবস্থায় যেকোনো সময় দু'আ করার বিষয়টিই প্রমাণিত হয়।

যাকাত

প্রশ্ন (৩১): পিতামাতাকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে কি?

-সাইফুল্লাহ
টাঙ্গাইল।

উত্তর: পিতামাতাকে যাকাতের মাল দেওয়া জায়েয নয়। কেননা সন্তান-সন্ততি ও তাদের সম্পদ মূলত পিতা-মাতারই সম্পদ। আমর ইবনু শুয়াইব রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমার নিকট ধন-সম্পদ আছে এবং আমার পিতা দরিদ্রতার দরুণ আমার ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী। তখন তিনি বললেন, 'তুমি ও তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উত্তম রিযিক্ব। সুতরাং তোমারা সন্তানের উপার্জন খাও' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ, হা/২২৯২; আহমাদ, হা/৬৬৭৮; মিশকাত, হা/৩৩৫৪)*। উল্লেখ্য যে, পিতামাতা নিজ স্বাধীনতায় পরিমিতভাবে ছেলের সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারবে। যদিও ছেলের সম্পদের ফারায়েয অনুযায়ী মালিক ছেলে নিজেই।

প্রশ্ন (৩২): ব্যাংকে ঋণ আছে। এমতাবস্থায় কি আমাকে যাকাত দিতে হবে?

-খুবাইব ইসলাম
পাবনা।

উত্তর: পরিবার ও সন্তানদের আহার যোগাতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হলে তা পরিশোধের পরে যাকাত দিতে হবে। উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, এটা তোমাদের যাকাতের মাস। অতএব, যার উপর ঋণের বোঝা আছে সে যেন আগে তা পরিশোধ করে। তারপর অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে যাকাত আদায় করে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৯৭৩)*। আর যদি ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাড়ি গাড়ির জন্য ঋণ নিয়ে থাকে যা সমাজে প্রচলিত আছে, তাহলে তার মূল সম্পদ নিসাবে পৌঁছলেই যাকাত দিতে হবে। আর এভাবে ঋণ নেওয়া জায়েযও নয়।

প্রশ্ন (৩৩): নিকটাত্মীয়দের যাকাতের সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া যাবে কি?

-মিলন ইসলাম
চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর: নিকটাত্মীয়-স্বজন যদি যাকাতের হক্বদার হয়, তাহলে তাদের যাকাতের সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া যাবে। একদা এক আনছারী মহিলা ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর স্ত্রী যায়নাব বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মাধ্যমে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের স্বামীদের প্রতি ও স্বামীদের পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি যাকাত দিলে এটা তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তাদের জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। আত্মীয়তার নেকী এবং দানের নেকী' *(ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০০)*। কারণ আল্লাহ তাআলা আট শ্রেণির লোকদের সকলকেই সমানভাবে যাকাত বণ্টন করে দেওয়ার আদেশ করেননি; বরং আট শ্রেণির লোক এই সম্পদের হক্বদার বলে উল্লেখ করেছেন *(আত-তওবা, ৯/৬০)*। অতএব, যখন যেখানে যতজন হক্বদার থাকবে, তাদের হক্বের পরিমাণ বিবেচনা করে প্রদান করতে হবে। সবাইকে সমান দেওয়াও আবশ্যক নয়। প্রয়োজনে কোনো হক্বদারকে বাদ দিয়ে গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্যকে সম্পূর্ণ মাল দেওয়া যেতে পারে।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (৩৪): অনেক জায়গায় মসজিদ, ঈদগাহ মাঠ ও কবরস্থানের উন্নয়নকল্পে ইসলামী মাহফিল আয়োজন করা হয়। এভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে আয়োজন করা যাবে কি? এবং এসমস্ত মাহফিলে ছওয়াবের আশায় দান করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান রনি
দত্তগ্রাম, বল্লা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: যেকোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে ইসলামী স্কলারদের মাধ্যমে ইসলামী মাহফিল করা যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবূকের যুদ্ধে ছাহাবীদের মাঝে ঘোষণা দিয়েছিলেন, যে এ যুদ্ধে সৈন্যদেরকে সাজিয়ে দিবে তার জন্য জান্নাত রয়েছে *(ছহীহ বুখারী, হা/২৭৭৮)*। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের ছালাত সমাপ্তি লগ্নে মহিলাদের কাছে গিয়ে দান করতে উৎসাহিত করলেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৩০৪)*। দান প্রকাশ্য ও গোপনীয় হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না' *(আল-বাকারা, ২/২৭৪)*। তবে গোপনীয় দান আল্লাহ তাআলার কাছে অতি উত্তম *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩১)*। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে

ছওয়াবের আশায় দান করলে আল্লাহ তাআলা উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন। উছমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মসজিদ পুনর্নির্মাণ করতে চাইলেন। কিন্তু লোকেরা তা পছন্দ করল না এবং সেটিকে তার পূর্বের অবস্থায় রেখে দিতে চাইল। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে তার অনুরূপ একটি ঘর নির্মাণ করবেন' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৩)*।

প্রশ্ন (৩৫): সন্তানের প্রতি পিতামাতার অন্যায় অথবা কোনো ধরনের বৈষম্য করার ফলে তাদের উপর অভিমান করে থাকা অথবা তাদের সাথে মনোমালিন্য থাকার ফলে কথা না বলা, খোঁজখবর না নেওয়া কি জায়েয?

-সাব্বির আহমাদ ওসমানী
মুগদা, ঢাকা।

উত্তর: প্রতিটি পিতামাতার উচিত সন্তানদের মাঝে ইনছাফপূর্ণ আচরণ করা। তার সন্তানদের মাঝে বৈষম্য করা কোনো পিতামাতার উচিত নয়। যদি কেউ তার সন্তানদের মাঝে বৈষম্য করে, তাহলে তা যুলম বলে গণ্য হবে। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তার পিতা তাকে একটি দাস উপহার দিলেন। তখন তার মা বললেন, আমি এতে সন্তুষ্ট নই, যতক্ষণ না তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সাক্ষী রাখ। অতঃপর বাশীর ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে তিনি যা করেছেন তা জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি কি তোমার সব সন্তানকে নু'মানকে যেভাবে দিয়েছ সেভাবেই দিয়েছ?' তিনি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো' *(ছহীহ বুখারী, হা/২৩৯৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৩০৫৫)*। ইসলামে মাতাপিতার অধিকার অনেক বেশি। তারা অন্যায় করলে বা সন্তানের প্রতি বৈষম্য করলেও সে কারণ দেখিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, কথা না বলা, খোঁজখবর না নেওয়া হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো' *(আল-ইসরা, ১৭/২৩)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শরিক করতে বাধ্য করে, তবে তাদের কথা মানবে না; কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে চলবে' *(লুকমান, ৩১/১৫)*। আবূ দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী (সর্বোত্তম) দরজা। সুতরাং তুমি চাইলে এ দরজাটি নষ্ট করে দিতে পার, অথবা চাইলে তা সংরক্ষণ করো' *(ইবনু মাজাহ, হা/৩৬৬৩; তিরমিযী, হা/১৯০০)*। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই রবের সন্তুষ্টি, আর পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই রবের অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, হা/১৮৯৯)*।

প্রশ্ন (৩৬): আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কিছু আরবী লেখা স্টিকার পাওয়া যায়, যা দোকানে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লাগানো হয়। যেটি দ্বারা বুঝানো হয়, এর মাধ্যমে ব্যবসা উন্নতি হবে। এসব স্টিকার কি লাগানো যাবে? যেমন- হাতের পাঁচ আঙুলের ন্যায় বা ৫ পাঞ্জাতন বা ডিজাইন করা আরবী লেখা।

-মো. সাগর মণ্ডল
চাঁদপুর।

উত্তর: ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য দোকানে বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যেকোনো স্টিকার লাগানো জায়েয নয়; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। পাক পাঞ্জাতন অর্থ পবিত্র পাঁচজন ব্যক্তি। এটা অমুসলিম শীআদের একটি বিশেষ আক্বীদা। তারা শুধুমাত্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)-কে পবিত্র মনে করে। অবশিষ্ট ছাহাবীগণকে গালিগালাজ করে, আবার কখনো কাফের সাব্যস্ত করে। সুতরাং পাক পাঞ্জাতনের স্টিকার (পাঁচ আঙুলের আকৃতিতে হোক বা অন্য যেকোনো আকৃতিতে) লাগানো হারাম। উক্ত আক্বীদা লালন করা কুফরী। উক্ত স্টিকারকে বরকতের মাধ্যম মনে করা শিরক।

ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি বা বরকত লাভের উপায় হলো- ১. সততা ও আমানতদারিতা রক্ষা করা *(ছহীহ বুখারী, হা/২০৭৯)*। ২. প্রতারণা না করা *(ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)*। ৩. সূদ বর্জন করা *(আল-বাকারা, ২/২৭৬)*। ৪. মিথ্যা কসম না করা *(ছহীহ বুখারী, হা/২০৮৭)*। ৫. দু'আ করা *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৭৩)*।

প্রশ্ন (৩৭): কোনো মহিলা গর্ভবতী হওয়ার পর বাচ্চা হওয়ার আগে বাচ্চার লিঙ্গ মেডিকেল পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে পারবে কি? এটা কি জায়েয নাকি এতে পাপ হবে?

-খন্দকার সাদাত
ঢাকা।

উত্তর: মূল প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে এটা জানা আবশ্যক যে, গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলা রাখেন; অন্য কেউ নয় *(আন-নামল, ২৭/৬৫)*। কোনো মাধ্যম ছাড়া অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে জানাকে 'গায়েবের জ্ঞান' বলা হয়। সুতরাং গর্ভস্থ বাচ্চার শারীরিক গঠন পূর্ণ হওয়ার পর আল্ট্রাসনোগ্রাফির

মাধ্যমে তার লিঙ্গ সম্পর্কে অবগত হওয়া কোনোভাবেই গায়েব জানার অন্তর্ভুক্ত নয় *(মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু উছায়মীন, ১/৬৮)*। দ্বিতীয়ত, গর্ভস্থ বাচ্চার লিঙ্গ জানার জন্য ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করা বা ডাক্তার কর্তৃক লিঙ্গ প্রকাশ করা উল্লেখযোগ্য দুইটি কারণে বৈধ নয়- ১. কিছু বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে জানা গেছে যে, গর্ভস্থ বাচ্চার লিঙ্গ জানার পর লিঙ্গ কাঙ্ক্ষিত না হওয়ায় বাচ্চাকে হত্যা করা হয়েছে অথবা বাচ্চার মাকে ডিভোর্স দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইসলামী শরীয়াহর একটি নীতি سد الذرائع (নিষিদ্ধ বিষয়ের মাধ্যম, ভূমিকা ও পথও নিষিদ্ধ) অনুযায়ী উক্ত কাজ অবৈধ। ২. বাংলাদেশে হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী গর্ভস্থ বাচ্চার লিঙ্গ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ *(দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি.)* আর প্রশাসনের নিয়ম মানা আবশ্যক; যদি ইসলামবিরোধী না হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫৭)*। এছাড়া এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে অগ্রিম খারাপ প্রভাব পড়ে। পাশাপাশি উক্ত কাজ একটি অনর্থক কাজ। রাসূল ﷺ বলেন, 'কোনো ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার সৌন্দর্য হলো, সে অনর্থক কথা বা কাজ পরিত্যাগ করে' *(তিরমিযী, হা/২৩১৭)*।

প্রশ্ন (৩৮): আমরা জানি মসজিদে কেনাবেচা বা এগুলোর কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রচার নিষেধ। এখন হজ্জ-উমরার বিজ্ঞপ্তি প্রচারও কি উক্ত নিষেধের আওতায় পড়বে?

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: হজ্জ-উমরা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এগুলো প্রচারের অপেক্ষা রাখে না। মসজিদে হজ্জ-উমরার প্রচার সম্বলিত যে ব্যানারগুলো দেখা যায় সেগুলো মূলত হজ্জ কাফেলা বা এজেন্সির বিজ্ঞাপন। এসব বিজ্ঞাপনের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয় না। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি মসজিদে কাউকে তার হারানো বস্তুর অনুসন্ধানমূলক ঘোষণা করতে শুনবে, সে যেন তাকে বলে, আল্লাহ তোমার হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দিক! কারণ মসজিদগুলো এসব উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬৮)*।

প্রশ্ন (৩৯): যারা প্রবাসে ইউরোপে থাকেন। এদের মাঝে যারা ভাতা পায় তাদেরকে বড়দিন বা খ্রিষ্টানদের উৎসবের মাসে ডিসেম্বরে অতিরিক্ত কিছু টাকা দেওয়া হয়। যেমন- আমাদের দেশে ঈদের সময় ঈদের উপলক্ষে ঈদের ভাতা দেওয়া হয়। এখন এই টাকাটি কি নিজের জন্য ব্যবহার করা জায়েয? নাকি ছওয়াবের নিয়্যত ছাড়াই দান করে দিতে হবে?

-ইমন।

উত্তর: বড়দিনসহ বিধর্মীদের কোনো উৎসবে অংশগ্রহণ করা হারাম। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত' *(আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)*। কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি বৈধ চাকরি করে, তাহলে তার জন্য বেতন গ্রহণ করা হালাল। তবে বড়দিনসহ বিধর্মীদের কোনো উৎসবে দেওয়া ভাতা গ্রহণ করা যাবে না এবং এদিন যেকোনো উপহার দিলে তাও গ্রহণ করা যাবে না।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৪০): সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীরা যদি বেতন বাড়ানোর জন্য বা অন্য কোনো কারণে কাজ বর্জন করে এবং যেসব দিনগুলোতে কাজ বর্জন করেছে সেসব দিনগুলোর বেতন ঠিকই নিচ্ছে। তাহলে তাদের এই আয় কি হালাল হবে?

-মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম আশেক
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

উত্তর: কর্ম বর্জন করে উক্ত দিনের বেতন নেওয়া হালাল হবে না। বেতন বাড়ানোর দাবি যৌক্তিক মনে হলে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা বা পরামর্শের মাধ্যমে জানাতে হবে। আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিন শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে আমি কিয়ামতের দিন নিজেই বাদী হব- (১) সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে অঙ্গীকার করে পরে তা ভঙ্গ করে; (২) সেই ব্যক্তি, যে একজন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে এবং (৩) সেই ব্যক্তি, যে কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয় না *(ছহীহ বুখারী, হা/২২২৭)*। কর্মচারীদের উচিত যে কাজের উপর চুক্তি হয়েছে তা পরিপূর্ণ সম্পাদন করা। উক্ত কাজ সম্পাদন ছাড়াই তার পারিশ্রমিক নেওয়া হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না' *(আন-নিসা, ৪/২৯)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করবে' *(আল-মায়েদা, ৫/১)*।

প্রশ্ন (৪১): একদল আলেম ফতওয়া দিয়েছে যে, সমুদ্রের মাছ ব্যতীত কাঁকড়া, অক্টোপাসসহ অন্য যা কিছু আছে তার সবই খাওয়া হারাম। এখন অনেক দোকানে কাঁকড়া, অক্টোপাস বিক্রি করা হচ্ছে। আমার দোকানেও সামুদ্রিক কাঁকড়া সেল করা হয়। আমি জানতে চাচ্ছি,

সামুদ্রিক মাছ ছাড়া কি অন্য সবকিছু হারাম? দলীলসহ জানাবেন।

-তাওসীফ ইনান
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর: সামুদ্রিক প্রাণী যা পানিতে বসবাস করে, তা কাঁকড়া হোক বা অন্য প্রাণী হোক তা খাওয়া এবং তা দিয়ে ব্যবসা করা হালাল; তবে ব্যাঙ ব্যতীত। এমনকি এগুলো মারা গেলেও খাওয়া যায়। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ 'সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৮৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭২৩২)*।

প্রশ্ন (৪২): আমি একজন ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তি। এক্ষেত্রে কি আমি অন্য ধর্মের মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারব? আর সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া কি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম নাকি হালাল?

-শাহ আলী মো. কামাল ইবনে বাদশা আজম-ঈ খা
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর: (১) একজন মুসলিমের জন্য কোনো বিধর্মী মালিকের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন- ক. তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হওয়া যাবে না। খ. এমন প্রতিষ্ঠান হওয়া যাবে না, যা কোনোভাবে ইসলাম বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করে। গ. ইসলাম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। ঘ. ইসলামবিরোধী কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না। ঙ. প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম বৈধ হতে হবে এবং মূলধন বা পণ্যসমূহ হালাল হতে হবে।

(২) ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের জন্য ট্যাক্স বা আয়কর প্রদানের নিয়ম নেই। যাকাতের বিধান আছে। সুতরাং আয়কর প্রদান আবশ্যক করা ইসলামের দৃষ্টিতে যুলম *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়িমাহ, ২৩/৪৪২)*। তবে দেশে যেহেতু শরীআহ শাসন নেই, তাই নিরুপায় হয়ে রাষ্ট্রের নিয়ম মানতে হবে। এক্ষেত্রে আয়কর প্রদানকারী গুনাহগার হবে না *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৭)*।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৪৩): বাসর রাতের কোনো সুন্নাহ বা আমল আছে কি? যদি থাকে তাহলে কীভাবে তা পালন করতে হবে? দলীলসহ জানাবেন।

-মেহেদী হাসান
দনিয়া, কদমতলী, ঢাকা।

উত্তর: বাসর রাতে পালনীয় বেশ কিছু আমল রয়েছে যা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো- ১. স্ত্রীর কপালের সামনের অংশে (নাসিয়া/চুলের অগ্রভাগে) হাত রাখা এবং হাদীছে বর্ণিত দু'আ পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোনো নারী, দাস বা বাহন লাভ করে, তখন সে যেন তার কপালের সামনের অংশ ধরে বলে اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِن خيرِها وخيرِ ما جُبِلَتْ عليهِ وأعوذُ بِكَ من شرِّها وشرِّ ما جُبِلَتْ عليه 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার কল্যাণ এবং যে কল্যাণের উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা কামনা করি আর তার অকল্যাণ ও যে অকল্যাণের উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে তোমার আশ্রয় চাই *(ইবনু মাজাহ, হা/১৯১৮)*। ২. স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দুই রাকআত ছালাত পড়া *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/১০৪৬০)*। ৩. সহবাসের সময় ইসলামের নির্দেশিত আদবসমূহ মেনে চলা আবশ্যক, এর মধ্যে রয়েছে সুগন্ধি ব্যবহার করা *(ছহীহ বুখারী, হা/২৬৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৯২)*। ৪. সহবাসের আগে হাদীছে বর্ণিত দু'আ পাঠ করা, بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا অর্থ: 'বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখো এবং তুমি আমাদের যা দান করবে, তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো' *(ছহীহ বুখারী, হা/৩২৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৩৪)*। ৫. স্বামীর জানা থাকা জরুরী যে, পায়ুপথে সহবাস হারাম এবং কেবল সেই স্থানেই সহবাস বৈধ যা সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র *(আল-বাকারা, ২/২২৩)*। ৬. সহবাসের পর গোসল ফরয, যদিও বীর্যপাত না ঘটে *(ছহীহ বুখারী, হা/২৯১; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৪৮)*। ৭. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহবাসের গোপন বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ না করা, যা হারাম *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৩৭)*।

প্রশ্ন (৪৪): শয়তানের ফাঁদে পড়ে জামাই তার শাশুড়ির সাথে অনৈতিক কাজ করে ফেলেছে। এখন তওবা করেছে। কেউ কেউ বলছে, এতে স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে, তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। আসলেই কি তালাক হয়ে গেছে? এই পাপ থেকে মুক্তির উপায় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: শাশুড়ি মায়ের মতো। শাশুড়ির সাথে এমন জঘন্য কাজ করা অনেক বড় পাপের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে বিবাহিত পুরুষ-নারী যেনা করলে হত্যার বিধান রয়েছে *(তিরমিযী, হা/১৪৩৪)*। সে অনুযায়ী দুজনেই রজমের সাজাপ্রাপ্ত। কিন্তু শাশুড়ির সাথে এমন অনৈতিক কাজ হয়ে গেলে স্ত্রী তালাক হয় না বা স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে না। কেননা কোনো হারাম হালালকে হারাম করতে পারে না *(আশ-শারহুল মুমতে,*

১২/১১৯)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ যদি শাশুড়ির সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হয়, তবে তার স্ত্রী হারাম হয় না *(ছহীহ বুখারীর অধ্যায়ের আলোচনা, ৭/১০)*।

প্রশ্ন (৪৫): স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হয়। কিন্তু স্বামীর রেখে যাওয়া ২ সন্তানই বাকপ্রতিবন্ধী। তারা দোকান চালাতে পারে না, এমতাবস্থায় স্ত্রী কি ৪৫ দিন পর দোকান চালাতে পারবে?

-হৃদয় মাহমুদ।

উত্তর: স্বামীর ইন্তিকালের পর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব *(আল-বাকারা, ২/২৩৪)*। ইদ্দত চলাকালীন সময়ে স্ত্রী ঘরের বাইরে বের হতে পারবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুরাইয়া বিনতু মালিক (যার স্বামী ইন্তিকাল করেছিল) রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বললেন, 'তুমি নিজ ঘরে অবস্থান করো ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত' *(আবূ দাঊদ, হা/২৩০০)*। সুতরাং জরুরী অবস্থা ব্যতীত ইদ্দত চলাকালীন সময়ে স্ত্রী ঘরের বাইরে বের হতে পারবে না। প্রশ্নে বর্ণিত নারীর উপর তার দুই সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত হবে না; বরং তাদের দাদা অথবা চাচার উপর উক্ত দায়িত্ব অর্পিত হবে। আর উক্ত নারীর দায়িত্ব অর্পিত হবে সেই পুরুষের উপর, যে ইসলামী বিধান অনুযায়ী সেই নারীর অভিভাবক সাব্যস্ত হবে। অতএব, দোকানে বসার প্রয়োজনে উক্ত নারী ঘর থেকে বের হতে পারবে না *(আল-মুগনী, ৮/১৬৩)*।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৬): উম্মু হানী রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ঘর থেকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মি'রাজ শুরু হয় এই ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-মো. আব্দুর রাজ্জাক

চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মি'রাজ তাঁর নিজ ঘর থেকে শুরু হয়। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি মক্কায় ছিলাম। তখন আমার ঘরের ছাদ খুলে দেওয়া হলো। এরপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অবতরণ করলেন। তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন, তারপর যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি একটি স্বর্ণের পাত্র আনলেন, যা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি তা আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন, তারপর তা পুনরায় জোড়া লাগালেন। এরপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে নিয়ে নিকটবর্তী আসমানে আরোহণ করলেন...' *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩)*। উম্মু হানী রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ঘর থেকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মি'রাজ এর ঘটনা সঠিক নয়, বরং যতগুলো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে উম্মু হানী রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ঘর থেকে মি'রাজের ব্যাপারে সবগুলোই দুর্বল।

প্রশ্ন (৪৭): 'শীতকালে ছিয়াম রাখা বিনা যুদ্ধে গনীমত লাভের সমান' এই হাদীছ কি ছহীহ?

-শাহিদুল ইসলাম

কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: উল্লিখিত বাক্য হুবহু হাদীছের বাক্য নয়। হাদীছের বাক্য হলো, (আমির বিন মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) 'শীতল গনীমত হলো শীতকালে ছিয়াম রাখা' *(তিরমিযী, হা/৭৯৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৯৫৯)*। ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত হাদীছের সনদকে মুরসাল (দুর্বল) বলেছেন *(তিরমিযী, হা/৭৯৭)*। অনুরূপভাবে শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত হাদীছের সনদকে দুর্বল বলেছেন *(যঈফুল জামি, ১/৫৭৫)*। তবে উক্ত বাক্যটি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর বক্তব্য হিসেবে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত *(বায়হাক্বী, হা/৮৪৫৫; আল-ইলাল ইবনু আবী হাতিম, ৩/১২১; আল-মাকাছিদ আল-হাসানাহ, ১/৪০৩)*।

দু'আ

প্রশ্ন (৪৮): সকাল-সন্ধ্যার দু'আগুলো কখন পড়তে হবে? ফজর ও আছর ছালাতের পর নাকি সূর্যোদয় ও মাগরিবের পর?

-মো. মিনহাজ পারভেজ

হড়গ্রাম বাজার, রাজশাহী।

উত্তর: সকালের যিকির-আযকারের সময় হলো ফজরের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং বিকালের যিকির-আযকারের সময় হলো, আছরের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত *(ক্ব-ফ, ৫০/৩৯; আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব, ইবনুল কায়্যিম, ১/৯৩)*।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯): আমার একটা বিড়াল ছিল। বিড়ালটি হঠাৎ খুব আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং আমার স্ত্রী ও বাচ্চাকে আঘাত করায় পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে দূরে একটি জায়গায় রেখে আসি। এখন আমি খুব অপরাধবোধে ভুগছি। ইসলামের দৃষ্টিতে এ কাজটি বৈধ কি? এখন আমার কী করা উচিত? উল্লেখ্য, অন্য কাউকে দিতে পারিনি, কারণ তার মধ্যে জলাতঙ্কের সব ধরনের লক্ষণ উপস্থিত ছিল।

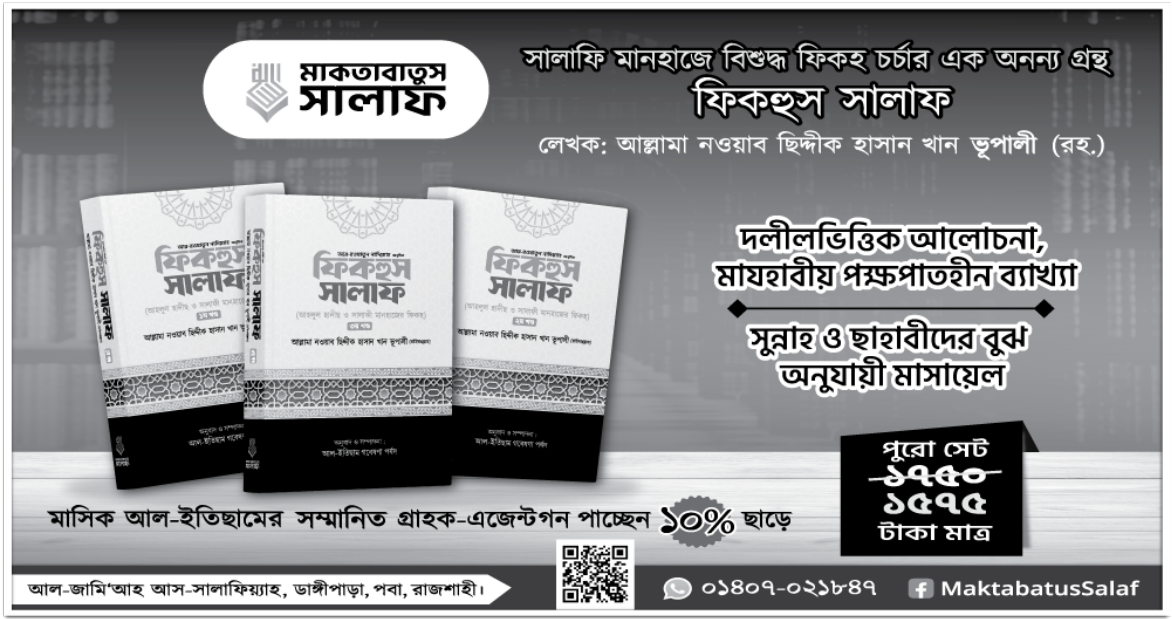
-আহমেদ
গাইবান্ধা।

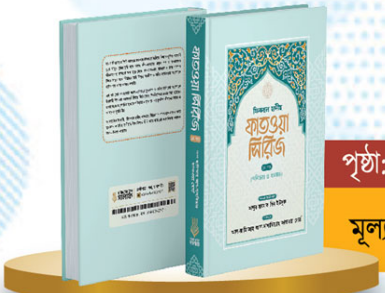
উত্তর: বিড়াল আমাদের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণকারী একটি প্রাণী *(আবূ দাঊদ, হা/৭৬)*। বিড়াল কখনো যদি ক্ষতিকারক (আক্রমণাত্মক) হয়ে ওঠে, তাহলে তাকে লোকালয় থেকে দূরে বা নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে আসবে এবং এতে কোনো পাপ হবে না। আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না’ *(আল-বাকারা, ২/২৮৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘এক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মারা যায়। মহিলাটি ঐ কারণে জাহান্নামে গেল। কেননা সে বিড়ালটিকে খানাপিনা কিছুই করাইনি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত’ *(ছহীহ বুখারী, হা/২৩৬৫)*।

প্রশ্ন (৫০): ইসলামে মেকআপ করার বিধান কী? বা এগুলোর ব্যবসা করার বিধান কী? অনেকে এত পরিমাণে মেকআপ করে যে অনেক সময় তাকে চেনা যায় না।

-সুরাইয়া ইয়াসমিন
সাভার, ঢাকা।

উত্তর: মেকআপ এর মাধ্যমে যদি সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে (ট্যাটু, মাইক্রোব্লেডিং, ভ্রু পাতলা করা/কৃত্রিম রূপ দেওয়া এবং মুখে এমন কিছু লাগানো যা ত্বকের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে), সুগন্ধিযুক্ত হয়, মেকআপের উপাদান হারাম হয় এবং বেগানা পুরুষদের সামনে তা প্রকাশ পায়, তাহলে মেকআপ করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশিত থাকে তা ছাড়া...’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*। আবূ মূসা আশআরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে কোনো নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে, এরপর এমন লোকদের পাশ দিয়ে যায় যাতে তারা তার সুগন্ধি পায়, সে যেনাকারিণী’ *(তিরমিযী, হা/২৭৮৬; নাসাঈ, হা/৫১২৬)*। ফ্যাশনের নামে নগ্নতা ও বেগানা পুরুষের সামনে সাজসজ্জা গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়, এমন ব্যবসা করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করো না’ *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। তবে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটানো ছাড়া এবং মেকআপের উপাদান যদি হারাম না হয়, তাহলে তার দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য গ্রহণের জন্য মেকআপ করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে তাদের স্বামীদের কাছে ছাড়া *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।





পৃষ্ঠা: ৪৬৪
মূল্য: ৫৮০/-



পৃষ্ঠা: ৪৬৪
মূল্য: ৩২০/-

ফিকহুল হাদীছ ফাতওয়া সিরিজ
সংকলনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ ফাতওয়া বোর্ড
ফাতওয়া বোর্ড প্রধান : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

আল্লাহর পথে যাত্রা
● আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

মাকতাবাতুস সালাফ
কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত
বইসমূহ



পৃষ্ঠা: ৬৪
মূল্য: ৮০/-



পৃষ্ঠা: ৩২
মূল্য: ৩০/-

নবীর দর্পণে আদর্শ শিক্ষক
● ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

ভিন্নমতের আলেমদের ব্যাপারে
সালাফদের আবস্থান
● আল হাসান ইসমাঈল

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

তুবা পাবলিকেশন
কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত

রাসূল ﷺ দেখতে যেমন ছিলেন
আব্দুর রহিম বিন আব্দুর রাযযাক

পৃষ্ঠা : ১১২
মূল্য : ৯০/-



এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে ভিজট করুন tubapublication.com

রাজশাহী
নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯০৯-৫২৩৯১৮

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচি

রামাযানের শুভেচ্ছা

হিজরী: ১৪৪৭ | ঈসায়ী: ২০২৬ | বঙ্গাব্দ: ১৪৩২

ঢাকার জন্য

তারিখ			বার	সাহারীর শেষ সময় ঘণ্টা-মিনিট	ইফতারের সময় ঘণ্টা-মিনিট
হিজরী	ঈসায়ী	বঙ্গাব্দ			
১ রামাযান	১৯ ফেব্রুয়ারি	০৬ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৫:১৩	০৫:৫৬
২ রামাযান	২০ ফেব্রুয়ারি	০৭ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:১২	০৫:৫৭
৩ রামাযান	২১ ফেব্রুয়ারি	০৮ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:১২	০৫:৫৮
৪ রামাযান	২২ ফেব্রুয়ারি	০৯ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:১১	০৫:৫৮
৫ রামাযান	২৩ ফেব্রুয়ারি	১০ ফাল্গুন	সোমবার	০৫:১০	০৫:৫৮
৬ রামাযান	২৪ ফেব্রুয়ারি	১১ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:০৯	০৫:৫৯
৭ রামাযান	২৫ ফেব্রুয়ারি	১২ ফাল্গুন	বুধবার	০৫:০৯	০৫:৫৯
৮ রামাযান	২৬ ফেব্রুয়ারি	১৩ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৫:০৮	০৬:০০
৯ রামাযান	২৭ ফেব্রুয়ারি	১৪ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:০৭	০৬:০০
১০ রামাযান	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:০৬	০৬:০১
১১ রামাযান	০১ মার্চ	১৬ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:০৫	০৬:০২
১২ রামাযান	০২ মার্চ	১৭ ফাল্গুন	সোমবার	০৫:০৫	০৬:০২
১৩ রামাযান	০৩ মার্চ	১৮ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:০৪	০৬:০৩
১৪ রামাযান	০৪ মার্চ	১৯ ফাল্গুন	বুধবার	০৫:০৪	০৬:০৩
১৫ রামাযান	০৫ মার্চ	২০ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৫:০৩	০৬:০৩
১৬ রামাযান	০৬ মার্চ	২১ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:০১	০৬:০৪
১৭ রামাযান	০৭ মার্চ	২২ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:০০	০৬:০৪
১৮ রামাযান	০৮ মার্চ	২৩ ফাল্গুন	রবিবার	০৪:৫৯	০৬:০৫
১৯ রামাযান	০৯ মার্চ	২৪ ফাল্গুন	সোমবার	০৪:৫৮	০৬:০৫
২০ রামাযান	১০ মার্চ	২৫ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৪:৫৭	০৬:০৬
২১ রামাযান	১১ মার্চ	২৬ ফাল্গুন	বুধবার	০৪:৫৬	০৬:০৬
২২ রামাযান	১২ মার্চ	২৭ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৪:৫৫	০৬:০৭
২৩ রামাযান	১৩ মার্চ	২৮ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৪:৫৪	০৬:০৭
২৪ রামাযান	১৪ মার্চ	২৯ ফাল্গুন	শনিবার	০৪:৫৩	০৬:০৮
২৫ রামাযান	১৫ মার্চ	০১ চৈত্র	রবিবার	০৪:৫২	০৬:০৮
২৬ রামাযান	১৬ মার্চ	০২ চৈত্র	সোমবার	০৪:৫১	০৬:০৮
২৭ রামাযান	১৭ মার্চ	০৩ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪:৫০	০৬:০৯
২৮ রামাযান	১৮ মার্চ	০৪ চৈত্র	বুধবার	০৪:৪৯	০৬:০৯
২৯ রামাযান	১৯ মার্চ	০৫ চৈত্র	বৃহস্পতি	০৪:৪৮	০৬:০৯
৩০ রামাযান	২০ মার্চ	০৬ চৈত্র	শুক্রবার	০৪:৪৭	০৬:১০

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া (www.bmd.gov.bd) | মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) | গণনা পদ্ধতি: University of Islamic Sciences,Karachi.

বি.দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য জেলাসমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণে অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচি দেখানো হয়েছে।

জেলাভিত্তিক সময়সূচি [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
নরসিংদী	-১	-১	-১	-১
গাজীপুর	০	০	০	০
শরিয়তপুর	০	+১	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	-১	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	-২	-২	-১	-১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৫	+৫	+৪
মাদারীপুর	+১	+২	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+১	+৩	+৩	+২

চট্টগাম বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৪	-৩	-৩	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৪	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৭	-৬	-৬	-৭
নোয়াখালী	-৩	-২	-২	-২
চাঁদপুর	-২	০	-১	-১
লক্ষ্মীপুর	-২	-১	-২	-২
চট্টগ্রাম	-৬	-৪	-৫	-৫
কক্সবাজার	-৬	-৪	-৫	-৬
খাগড়াছড়ি	-৬	-৬	-৬	-৭
বান্দরবান	-৮	-৬	-৬	-৭

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
সিলেট	-৬	-৭	-৬	-৬
মৌলভীবাজার	-৬	-৬	-৬	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪	-৪
সুনামগঞ্জ	-৪	-৫	-৪	-৪

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
শেরপুর	+১	+১	+১	+১
ময়মনসিংহ	০	-১	০	০
জামালপুর	+২	+১	+২	+২
নেত্রকোণা	-২	-২	-১	-১

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+৩	+২	+২	+২
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৪	+৪	+৪	+৪
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭
নাটোর	+৫	+৫	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৫	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+৯	+৯
নওগাঁ	+৬	+৫	+৬	+৬

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
যশোর	+৫	+৬	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৫	+৬	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৭	+৬
কুষ্টিয়া	+৬	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৫	+৪	+৪
বাগেরহাট	+৩	+৪	+৩	+৩
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
পঞ্চগড়	+৭	+৬	+৭	+৭
দিনাজপুর	+৫	+৬	+৬	+৭
লালমনিরহাট	+৩	+৩	+৩	+৪
নীলফামারী	+৫	+৫	+৬	+৬
গাইবান্ধা	+৩	+২	+৩	+৩
ঠাকুরগাঁও	+৮	+৬	+৭	+৮
রংপুর	+৪	+৪	+৪	+৫
কুড়িগ্রাম	+৩	+২	+৩	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
ঝালকাঠি	+১	+২	+২	+১
পটুয়াখালী	০	+১	+১	+১
পিরোজপুর	+১	+৩	+৩	+২
বরিশাল	০	+১	+১	০
ভোলা	-১	০	+০	-১
বরগুনা	+১	+৩	+২	+১

সাহল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন,'যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে; ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে'
(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮)।